প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা ১৪৩২

১৪৩২ : প্রবাস বন্ধু : সূচীপত্র : নববর্ষ সংখ্যা : 2025

সম্পাদকীয়	মালবিকা চ্যাটার্জী (ডিকেটার, জর্জিয়া)	2
স্মৃতিচারণ: ৺শ্রী দিলীপ কুমার দত্ত এবং ৺শ্রী গঙ্গা নারায়ণ ঘোষ		3-16
গদ্য		
ইতিহাসের পাতা থেকে	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	18
বর্ণপরিচয়-এর জন্মদিন	চিত্ত ঘোষ (কলকাতা, ভারত)	23
দুই পুরুষ	ডাঃ শান্তনু মিত্র (কলকাতা, ভারত)	25
বয়স ও ভুলোমন	মৃণাল চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	27
বাবা	আনন্দিতা চৌধুরী (ইস্ট ব্রান্সউইক, নিউ জার্সি)	29
নিশীথ বল্লরী	অলোক কুমার চক্রবর্তী (কলকাতা, ভারত)	30
নীলাম্বরের শাপে বর	শান্তনু চক্রবর্তী (এডিনবার্গ, টেক্সাস)	52
বৃষ্টি নামে	বিষ্ণুপ্রিয়া (ইউ এস এ)	61
এক কল্পনা-বিলাস	আশীষ দত্ত রায় (মানালি, ভারত)	67
কাছে দূরে	সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)	68
ইবলিশ	নূপুর রায়চৌধুরী (অ্যান আর্বার, মিশিগান)	76
প্রত্যাবর্তন	বীরেশ্বর মিত্র (পুনা, ভারত)	78
ইটাচুনা রাজবাড়ি	মালবিকা চ্যাটার্জী (ডিকেটার, জর্জিয়া)	81
পুরী স্পেশাল	বৈশাখী চক্কোত্তি (কলকাতা, ভারত)	83
কবিতা		
রবীন্দ্রনাথের প্রতি	মণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	39
শেষ কথা	দেবাশিস মজুমদার (অ্যালেকজান্ড্রিয়া, ভার্জিনিয়া)	39
আমৃত্যু, কবিতা	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	40
তোমার অভাবে	রজতকান্তি সিংহচৌধুরী (দুর্গাপুর, ভারত)	41
কথা	অযান্ত্রিক (কলকাতা, ভারত)	41
বাঙালি জীবন, বেড়াল ও হায়েনা, জল বাঙালি	শেলী শাহাবুদ্দিন (স্টোন মাউন্টেন, জর্জিয়া)	42
মনসঙ্গীত ১, মনসঙ্গীত ২	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	43
গলি, পরিচয়	শঙ্কর তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	44, 45
স্বপ্নময় দৃষ্টি	বৈশাখী চক্কোত্তি (কলকাতা, ভারত)	45
এক মুঠো প্রেম দাও, আমি তো বৃত্ত আঁকিনি	সুব্রত ভট্টাচার্য (কলকাতা, ভারত)	46
যাহা দিন তাহা তার রাত্রি	ডাঃ নিবেদিতা গাঙ্গুলী (হিউস্টন, টেক্সাস)	47
ধরণীর হালচাল, ধ্বংসকান্ড: পোড়ন-ভাঙ্গন-নিধন, আলো দেখব কবে	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	47, 48
অভীপ্সা	কল্যানী মিত্র ঘোষ (স্যান ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া)	49
অলৌকিক শষ্যচাষ	পৃথা চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	49
যখন বাবা আর থাকেন না	লালিত্য ললিত (দিল্লি, ভারত) অনুবাদ: বেবী কারফরমা (কলকাতা, ভারত)	50
সময়, বন্ধু	তৃপ্তি চক্রবর্তী (কলকাতা, ভারত)	51

প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা

বৈশাখ ১৪৩২, এপ্রিল ২০২৫

প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র সভ্যবৃন্দ

প্রচ্ছদ চিত্র:

ইন্টারনেট থেকে নেওয়া হয়েছে

কার্যনির্বাহী সদস্য:

চন্দ্রা দে

শ্যামলী মিত্র

অসিত কুমার সেন

সুজয় দত্ত

মালবিকা চ্যাটার্জী

প্রবাস বন্ধু পত্রিকা কেবলমাত্র

'প্রবাস বন্ধু ওয়েবসাইট'-এ প্রকাশিত হয়

https://www.prabashbandhu.org/

সম্পাদকীয়

বিশ্বায়ন (globalization) বর্তমান জগতে একটি অত্যন্ত আবশ্যিক অবস্থা। আজকের যুগে আমরা আপন গন্ডি ছাড়িয়ে পরিব্যাপ্ত সমাজের অংশীদার হতে চাই, যার ফলে একটা বৈশ্বিক যোগসাধন হয়। একে অপরের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে এবং শিখতে পারা যায়। সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, মানবিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্র সুদৃঢ় হয়।

এটি সম্পূর্ণ নতুন কোনো পরিস্থিতি নয়। পৃথিবী যখন উন্নতির শিখরে পৌঁছায়নি তখনও বিভিন্ন দেশ তাদের আশপাশের দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের পরিধি প্রসার করেছিল। তখন যোগাযোগের এমন সুব্যবস্থা ছিল না, তবু মানুষ তাদের জীবনের মান উন্নত করার জন্য বহু কষ্ট করেও এগিয়ে দিয়েছে সাহায্যের হাত; আদান-প্রদান হয়েছে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু, পরিচ্ছদ বস্তু ইত্যাদি; তখন ওটুকুই যথেষ্ট ছিল। ক্রমশ যখন এসব যোগাযোগ সহজ হতে শুরু করল তখন জ্ঞান, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি – এসব ক্ষেত্রগুলোও দেশের মানুষ উদ্‌ঘাটন করতে লাগল; যার ফল আজকের পৃথিবী, যেখানে কোনো জায়গাতেই যোগাযোগের অন্তরায় নেই।

বস্তুত এই সম্প্রীতি রক্ষা করলে সব দেশ এবং সেখানের মানুষ নানাভাবে লাভবান হতে পারে – তার নজির জগৎ জুড়ে রয়েছে। কিন্তু সযত্নে গড়ে তোলা এই সম্পর্কগুলো যদি আমরা প্রতি পদে অগ্রাহ্য করি তাতে নিজের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। অহংকারী ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল হয়ে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারার দৃষ্টান্তও জাজ্জ্বল্যমান। তবু আশা রাখা যেতে পারে কোনো একদিন হয়তো সেইসব অহংকারী মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবে।

বরণ করি নতুন বছরকে। নানাবিধ বাধাবিপত্তি টপকে নববর্ষে সকলের জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক।

সম্প্রতি হিউস্টন প্রবাস বন্ধু পাঠচক্রের দুজন সদস্য ৺শ্রী দিলীপ কুমার দত্ত এবং ৺শ্রী গঙ্গা নারায়ণ ঘোষ পৃথিবীর গন্ডি অতিক্রম করে চলে গেছেন। দুজনেই রেখে গেছেন হিউস্টন বঙ্গ সমাজে অপরিমেয় অবদান। তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রবাস বন্ধুর পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই এবং তাঁদের দুই পরিবারের সবার প্রতি সহৃদয় সহানুভূতি জানাই।

শুভেচ্ছা জানাই নতুন বছর নতুন আশায় ভরে থাক।
মালবিকা চ্যাটার্জী

পত্রিকায় ব্যবহৃত এবং অনুল্লিখিত ছবিগুলি ইন্টারনেট থেকে নেওয়া হয়েছে।

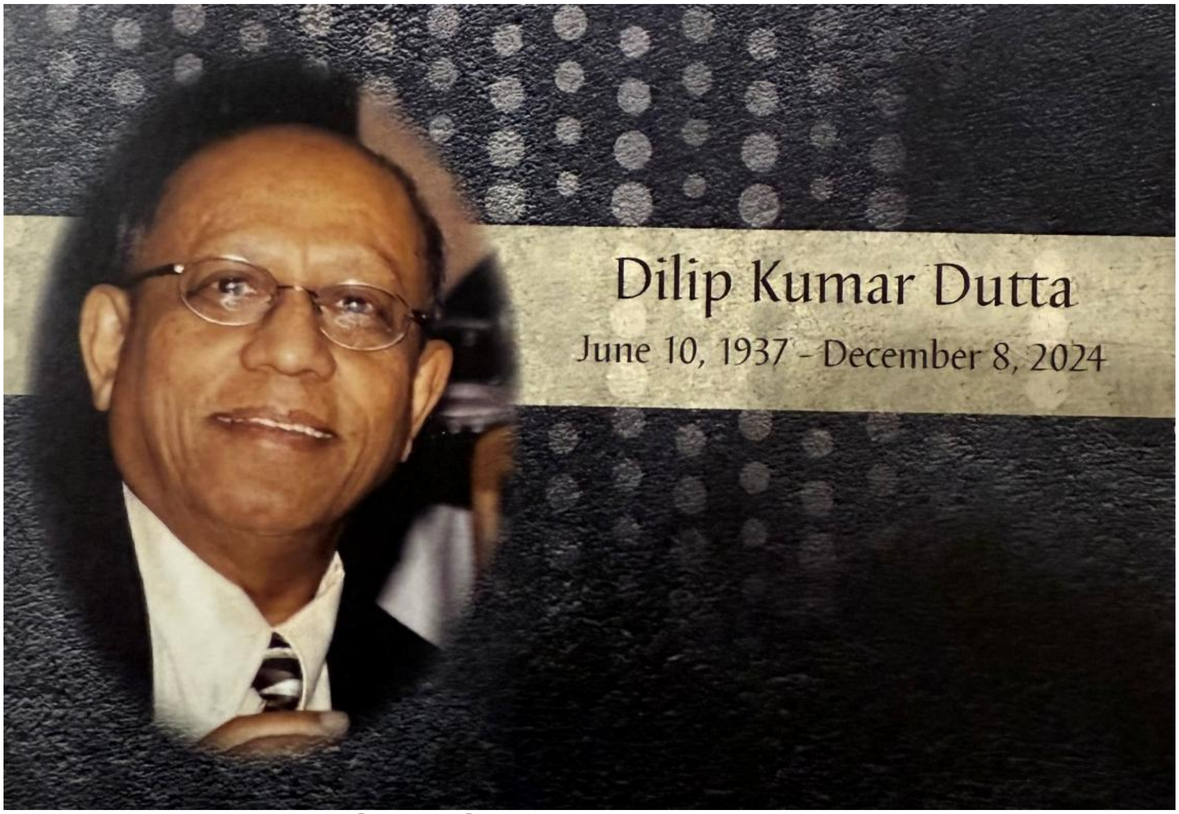

৺শ্রী দিলীপ কুমার দত্ত স্মরণে

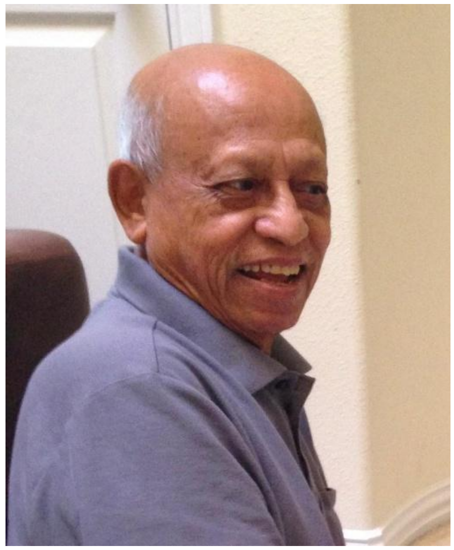

Dilip Kumar Dutta, 87, of Richmond, Texas, passed away peacefully on December 8, 2024.

Born on June 10, 1937, in Kolkata, India, Dilip's journey through life was marked by boundless curiosity, passion, and love for his family and community.

He was a fixture in the Bengali Community of Houston since 1977 and one of the earliest leaders of the Houston Durgabai Society, serving as its President in the late 1990s and early 2000s during its most critical years.

Dilip grew up in Calcutta (Kolkata), India, and in the village of Nanikshir, Bangladesh. His childhood was marked by the impacts of WWII, including the Japanese bombing of Calcutta in 1942, the Bengal Famine of 1943 and the Independence and Partition of India in 1947 and associated sectarian strife. He was the oldest of 1o children ultimately becoming the family's primary breadwinner.

Dilip was a proud graduate of Jadavpur University, where he earned his Bachelor of Science in Engineering while simultaneously working the night shift at a factory to support his family. In 1969, he embarked on a new chapter, moving to the United States to pursue professional opportunities. He initially settled in Philadelphia and earned a second degree while working full time: a master's in engineering from Penn State University.

On January 28, 1974, he married Sukti Majumder in Kolkata, beginning a partnership filled with love, shared laughter, and cherished memories.

Together, they built a life enriched by music, culture, and family. In 1977, Dilip and Sukti and their young son moved from Philadelphia to Houston where Dilip would embark on a decades-long career with the firm now known as KBR. His career took him all over the world and was a testament to his

dedication and skill. He lived in Indonesia, Venezuela and Mexico while leading major infrastructure projects in those countries.

Dilip's booming voice, which could dominate a room, will forever resonate in the hearts of those who knew him. A gifted singer, he shared his talent generously, even in his final days. He was a lover of slapstick comedies, a creator who delighted in building things, and a vibrant spirit who poured his energy into his communities. He adored playing and laughing with his grandchildren, cherished conversations with his brothers and sisters and friends, and relished life's simple joys-chaat, peanuts, and ice cream floats among his favorites.

Dilip was a man who loved to laugh, despised dogmatism and sectarianism, and embraced life with a rare authenticity. His legacy lives on in the countless lives he touched with his kindness, wisdom, and humor.

He is survived by his loving wife, Sukti (nee Majumder) Dutta; sons, Aurko Provo Dutta and Amartya Kumar Dutta; daughter-in-law, Rupinder Kaur (nee Sangha); grandchildren, Aarav Singh, Jayna Kaur, Rohanna Kaur; siblings, Himadri Kumar, Ajoy Kumar, Jayanta Kumar, Dolly, Barindra Kumar and Smriti; and numerous other relatives and friends.

Dilip will be deeply missed, but his memory will forever be a source of inspiration and joy for all who had the privilege of knowing him.

আমার বড়দা

কোথা থেকে শুরু করব ভাবতে ভাবতেই এতটা সময় পেরিয়ে গেল| শৈশব থেকে যৌবন আর আজ এই চুয়াত্তরের মাঝখানে আমার অস্তিত্বের সবটা জুড়েই আমার দাদা| কার সাথে তুলনা করব? একটা প্রকান্ড বটগাছ যেন আমার দাদা, যার স্নেহ-মমতা, আগলে রাখার অসীম ক্ষমতার অজস্র ঝুরি আমার আর আমাদের পরিবারের সকলকে সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে সামলে রেখেছিল এতগুলো বছর ধরে| যখনই কোনও পরিস্থিতির সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে শিউরে উঠেছি, তখনই সেই নরম হাসিতে একটাই জবাব পেয়েছি, "ভাবছিস কেন? আমি তো আছি| যা হবে সব সামলে নেব| যদি মনে হয় এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত, তবে পিছিয়ে যাবি না, এগিয়ে যাবি|" তখন বুঝিনি কথাগুলোর মর্ম| এখন ভাবি কতখানি জোর ছিল সেই কথাগুলোর মধ্যে| যে মানুষ আমার অস্তিত্বের এতখানি জুড়ে রয়েছে, আজ তাকে নিয়ে ভাবনার সমুদ্র পারাপার করা যায় – সেই আবেগ ও অনুভূতি লিখে প্রকাশ করা আমার সাধ্যের অতীত|

আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি| বড়দা একদিন লাল রঙের একটা কার্ড নিয়ে এল, যাতে আমার নাম লেখা, ছবি লাগানো এবং ওপরে লেখা গ্রাহক নং ৯৯৯ – সত্যজিৎ রায় এবং লীলা মজুমদার সম্পাদিত 'সন্দেশ'| প্রথম লেখা 'জ্ঞানদাতা পটলদাদা' – সবটাই দাদার সক্রিয় অনুপ্রেরণা| মনে আছে দাদার হাসিমুখটা, "আমার ভাই লিখেছে|"

উত্তর কলকাতায় কুমোরটুলির পাশে শোভাবাজারে গঙ্গার ধারে 'রূপমঞ্জরী' ভবনে কেটেছে আমার শৈশব ও যৌবনের মধ্যভাগ| লোডশেডিংয়ের রাতে প্রায়ই ছাদের পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে গঙ্গায় স্টিমারের ভোঁ শুনতে শুনতে কত গল্প করেছি দাদার সাথে| মনে হয় সেই দিনগুলো কত যুগ আগের, আবার কখনো মনে হয় এই তো সেদিনের কথা!

যখন আমি ক্লাস এইটে, একটা বড় দুর্ঘটনায় দাদা প্রায় চার মাস বিছানায় ছিল| হাতে বুকে প্লাস্টার, মা দাদার মাথা ধুয়ে দিত আর আমি গামছা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতাম| দাদা হেসে বলত, "যা, তুই পড়তে যা|"

এই তো সেদিনের কথা – আমি যখন দেশ ছেড়ে প্রথমবার বিদেশে যাই, দাদা-বৌদি দুজনেই তখন কলকাতায়| দাদা নিজে হাতে মায়ের হাতে-চালানো সিঙ্গার সেলাই মেশিনে আমার স্যুটকেসের জন্য একটা নীল রঙের কভার বানিয়ে দিয়েছিল| অনেকেই সেই দেখে হেসেছিল; দাদা বলেছিল, "এয়ারপোর্টের কনভেয়ারে দূর থেকে দেখেই তোর বাক্সটা চিনে নিতে পারবি|" কতটা দূরদর্শিতা ও ভালবাসা ছিল দাদার ভাবনায়!

আমার মেয়ের বিয়েতে বড়দা কন্যা সম্প্রদান করেছিল| অগাধ স্নেহ ও যত্ন ছিল দাদার চোখে| আমার মেয়ে বলেছিল, "বাবা, জ্যেঠুর মধ্যে এমন এক ভালবাসা আছে যাতে সম্প্রদানের সময় আমার দিকে তাকিয়ে যখন আশীর্বাদ করছিলেন, আমার সমস্ত অস্তিত্ব নরম হয়ে চোখের জল হয়ে বেরিয়ে এসেছিল| একটা মানুষ কোথা থেকে পায় এমন হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসার উৎস! আমার ছেলেও বলে, "জ্যেঠু আলাদা, সবার থেকে আলাদা| কী হিসেবে আলাদা বলতে পারব না, কিন্তু জ্যেঠু যখন আমার মাথায় হাত রাখেন আমি একটা অদ্ভুত স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শ পাই|"

ভাবতে বসলে আবেগে, শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় চোখ ভিজে আসে; এমন মানুষের জন্য সবকিছু করা যায়!

এই লেখা কোথা থেকে শুরু করেছিলাম, কোথায়ই বা শেষ করব জানি না| কয়েক শতাব্দী ধরে আমার বুকের মধ্যে যে অনুভূতি জমাট বেঁধে রয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই! বার বার শুধু মনে হয় – "দাদা, তুই আমার অহংকার! আমি ধন্য, তুই আমার দাদা!"

প্রণাম|...

জয়ন্ত কুমার দত্ত

শ্রী দিলীপ কুমার দত্ত

প্রায় তিন দশক ধরে দিলীপদা, শুক্তিদি এবং তাঁদের পরিবারের সাথে আমাদের জানাশোনা। তাঁরা বাঙালি সংস্কৃতি এবং সামাজিকতা ভালবাসেন। তাঁদের সাথে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক খুবই সৌহার্দপূর্ণ ছিল। মাঝে-মধ্যে বাড়িতে যাওয়া-আসা হতো। প্রতিটি রবীন্দ্র জয়ন্তীতে তাঁদের বাড়িতে অন্য অনেকের সাথে আমরাও নিমন্ত্রণ পেতাম। প্রয়াত দিলীপদা একজন প্রাণবন্ত এবং জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তিনি একজন ভাল বক্তা এবং গায়ক ছিলেন। কথা বলার সময় যুক্তিসহ বক্তব্য রাখতেন; তা কখনো তর্ক পর্যায়ে যেত না। প্রকৌশলী হিসাবে পেশাগত অর্জন ছাড়াও তাঁর সামাজিক অর্জন অনেক। তিনি হিউস্টন দুর্গাবাড়ি নির্মাণে এবং এর সংবিধান প্রণয়নে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। শেষের দিকে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তাঁর আন্তরিকতা, আতিথেয়তা ও আপ্যায়নে আমরা কোন তফাৎ দেখিনি। একজন শ্রদ্ধেয় শুভানুধ্যায়ীর মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

ভজেন্দ্র এবং কল্যাণী বর্মন

দিলীপদা

দিলীপদা ও শুক্তিদি হিউস্টনে অনেক দিনের বাসিন্দা এবং তাঁরা সকলকে তাঁদের স্নেহের আঁচলে বেঁধে রেখেছেন বরাবর।

যেদিন থেকে ওঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেদিন থেকেই মনে হয়েছে এঁদের যেন অনেকদিন ধরেই চিনি।

সবাইকে মাতিয়ে রাখার একটা সুন্দর ক্ষমতা ছিল দিলীপদার। তাঁর নানা ধরনের গল্প, গান ইত্যাদিতে আমরা মশগুল হয়ে যেতাম।

অপরপক্ষে তাঁকে দেখেছি তাঁর ছোট ছোট নাতিনাতনিদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে খেলাধুলো করতে।

দিলীপদা ও শুক্তিদির যুগল উপস্থিতি সব সময়ই আমার মনে একটা তৃপ্তি এনে দিত।

দিলীপদার উদ্দেশ্যে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম রাখি।

মালবিকা চ্যাটার্জী

শ্রী দিলীপ কুমার দত্ত স্মরণে

দিলীপ দত্তর সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের পরিচয়।
১৯৯০ সালে কর্মসূত্রে নিউ ইয়র্ক থেকে হিউস্টনে আসা আমাদের। এসেই যাঁদের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় ঘটে তাঁদের মধ্যে দিলীপ ও শুক্তি দত্ত অন্যতম। তাঁরা দুজনেই অত্যন্ত বন্ধু বৎসল। তাঁদের আন্তরিকতা আমাদের পরিবারকে নতুন জায়গায় মানিয়ে নিতে অত্যন্ত সাহায্য করে। আমরা আজও তার জন্য কৃতজ্ঞ।
এরপর কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। দুর্গাবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, টেগোর সোসাইটি গড়ে উঠেছে, তিনটি বঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে হিউস্টনে – এসবের মাধ্যমে পরিচয় আরো দৃঢ় হয়েছে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে দুর্গাবাড়ি আর টেগোর সোসাইটির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারায়। এসবই আমাদের সৌভাগ্য।
দিলীপ দত্তর মতো একজন ভদ্রলোক সমাজকে সমৃদ্ধ করে।
তাঁর প্রয়াণে আমরা শোকাহত। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

মৃণাল চৌধুরী

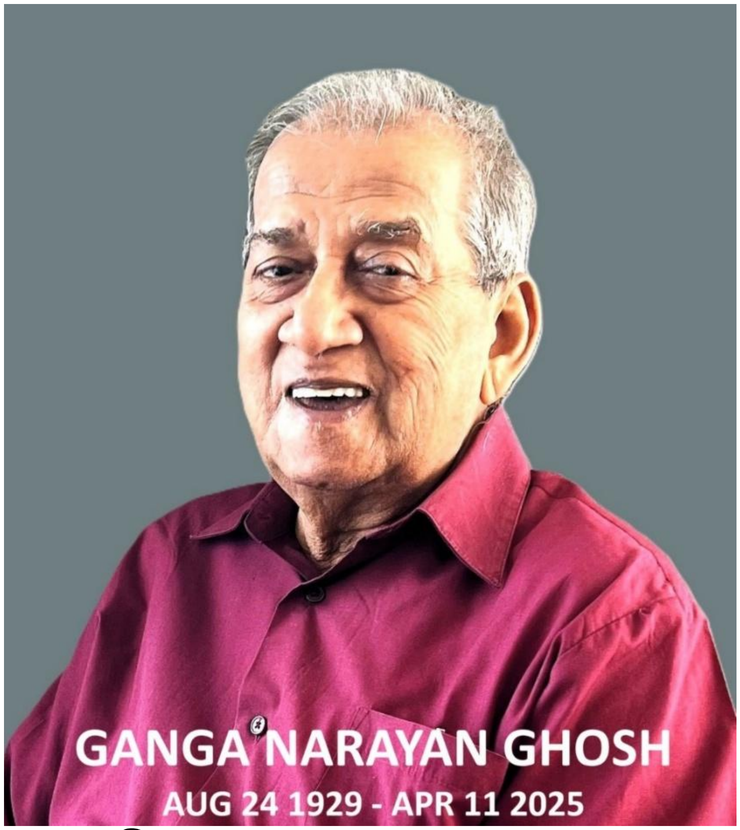

৺শ্রী গঙ্গা নারায়ণ ঘোষ স্মরণে

শিল্পী: শ্রীমতী রাণী ঘোষ

Life of Ganga Narayan Ghosh

Ganaga Narayan Ghosh was born on August 24, 1929 and went to his heavenly home on April 11, 2025 in his sleep.

He had a difficult but fulfilling life throughout as if God tested him all along.

Right from his early preteen age, his mother passed away and he being the eldest started helping his father to take care of three younger brother and sisters. Financial hardships as I know was tough on them. But my grandfather saw to it that all four of them got a good education. He graduated from Jadavpur Engineering college in Mechanical Engineering in 1952 though he lost a year due to being very sick of Malnutrition.

He bounced back as always and joined Assam Oil Company in Digboy, Assam and then met his loving wife Rani and got married in 1956. Later he came to Calcutta where he joined ICI and then started his Fabrication factory in Baguiati. By then his family had grown with three children and three dogs. By 1967 the Naxalites and Communists started troubling him to put their men in his factory which he declined and started getting death threats. At that time a lot of family members migrated to USA, but he always wanted to do something for his country. He decided to leave Calcutta with his family in his ambassador car and drove to Bombay to start a new life. Instead of driving straight to Bombay, he saw the entire north India and showed every nook and corner of Bihar, UP, Haryana, Delhi Gujrat on the way. Later he drove all over India with his family and we were fortunate to see the entire Southern and Eastern India by road.

In Bombay, he started his new life and again revived his factories, working for ICI for a short while. It amazed me how he ran his business without paying a single bribe to any official and fought it all the way.

He retired early and joined a Law college and got his law degree and then started dedicating his life to Charity with a purpose of giving a trade to the poor and he believed passionately, that if he could make a difference in keeping India clean, then it would solve a lot of India's problem and would eventually be a great county again.

Around 1990 he emigrated to Houston as all his children were in the USA by then, but he always stayed independently and never asked us for anything. He continued his life's work in Houston till his last days when he just could not move.

What I liked about him ways he always converted a threat into an opportunity. I, like many of his friends disagreed many times on his way of work/life, we all always agreed to disagreed and eventually agreed on the big picture.

We all wish him all the best in his next phase of his life.

Sudip Ghosh

In loving memory of our Dad, Ganga Narayan Ghosh

The passing of our dad on April 11 2025 has left a void in our hearts that's impossible to fill.

A Man of Integrity. Our dad was a man of unparalleled integrity. He believed in doing the right thing, even when it was hard or unpopular. His honesty and strong moral compass were clear in everything he did, from his career to his relationships with family and friends. He taught us that integrity isn't just about honesty; it's about being true to yourself and your beliefs.

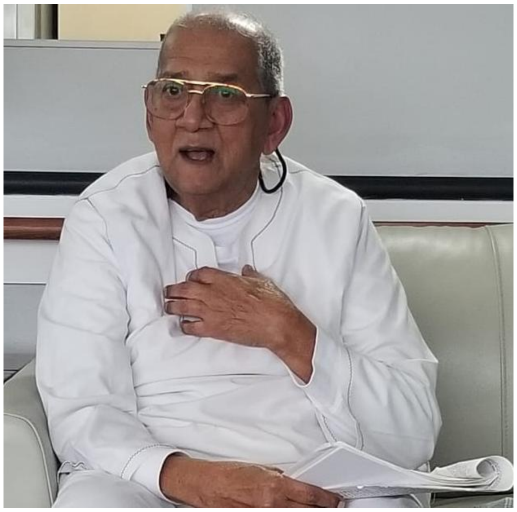

A Loving Husband and Father. At his core, Dad was a family man. His love for Mom was a beautiful example of partnership and commitment. My father was tough when it comes to discipline but as soft as cotton when it comes to my mother. They had a bond built on respect, understanding, and unwavering support.

Continuing His Legacy. Even though Dad isn't here physically anymore, his legacy lives on in the values he instilled in us. We strive to honor his memory by living a life of integrity, showing love and kindness to others, and finding joy in the simple things. His influence is woven into who we are today, and we are forever grateful to him. May he rest in peace forever.

Archana Karnik

শ্রী গঙ্গা নারায়ণ ঘোষ

গঙ্গা নারায়ণ ঘোষ নামটি রয়ে গেছে, মানুষটি যে চলে গেছেন সেটা এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না| সবাই ওঁকে গঙ্গাদা বলে ডাকলেও, আমার কাছে তিনি ছিলেন বাবার মতন, ডাকতাম যদিও মেসোমশাই বলে| মহীরুহর মতন বহুদিন ধরে মেসোমশাই আমাদের মাথার উপরে ছিলেন বলে ধরে নিয়েছিলাম ৯৫ বছর পেরিয়ে যাওয়া মানুষটি চিরকালই আমাদের সাথে থাকবেন| পৃথিবীর মানুষের জন্য, বিশেষ করে ভারতবাসীদের জন্য ওঁর এতই দরদ ছিল যে খেয়ালই ছিল না প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে একদিন তাঁকেও পার্থিব শরীর ছেড়ে চলে যেতে হবে|

আমার সাথে মেসোমশাইয়ের প্রথম পরিচয় ২০০২-এ, দুর্গাবাড়ির অডিটোরিয়ামের সামনের দুধাপ সিঁড়িতে| মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম ওঁর উৎসাহভরা ভাবনাচিন্তা| মানুষ যে বয়সে এসে রিটায়ার করে নভেল পড়বার কথা ভাবে, সেই বয়সে উনি আমেরিকায় এসে ‘এলেম নতুন দেশে’র অদম্য শারীরিক, মানসিক এনার্জি নিয়ে নানা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন|

একজন মানুষের জীবনদর্শন বুঝতে গেলে চলে যেতে হয় তার শৈশব বা যৌবনে| বড় বড় চিন্তাভাবনার বীজ তখনই বপন হয়ে থাকে| একেবারে ছোট্ট বয়স থেকেই মেসোমশাই ছিলেন তাঁর পরিবারের মুশকিল আসান| বাড়ির প্রথম সন্তান, কয়েকজন ছোট ভাইবোন, তার উপর মা খুব অসুস্থ| শয্যাশায়ী মায়ের থেকে নির্দেশ নিয়ে সংসারের নানান খুঁটিনাটির ভার নিজের ইচ্ছেয় কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন| দক্ষতার সাথে সেলাই-মেশিন চালানো থেকে শুরু করে রুটি করা, হ্যারিকেনের চিমনি পরিষ্কার করে ফিতে পরানো, কুয়ো থেকে জল তোলা, উনুন ধরানো, সবার ছোট্ট বোনটির যত্ন নেওয়া, কী না করতেন! তাছাড়া পড়াশোনার চাপ তো আছেই|

যে কোনও সমস্যা সমাধানের ডিজাইন ওঁর মাথায় খেলতেই থাকত| সেই প্রসঙ্গে উনুনের গল্প না বললেই নয়| রান্নাঘরে

ছিল দুটো উনুন – একটা সাবেকি বালতি উনুন, যেটা উঠোনে ধরিয়ে নিয়ে আসতেন| আরেকটি রান্নাঘরেই গড়া, কাজেই ওটা ধরানোমাত্র বাড়ির সবাইকে কেশে অস্থির হতে হতো| ক্লাস নাইনে এসে মেসমশাইয়ের মনে হ’ল এর একটা বিহিত না করলেই নয়| লেগে পড়লেন – সবার আগে খাতা-পেন্সিল নিয়ে আঁক কষে, তারপরে একজন ঝালাইওয়ালাকে সেটা বুঝিয়ে এমন এক বিচিত্র ডিজাইনের চিমনি বানালেন যে ধোঁয়া এক্কেবারে হাওয়া| তার ফলে বাড়ির সবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচা|

স্কুল থেকে ছোট্ট বোনকে বাড়িতে দেখতে আসতেন কয়েকবার| মা শয্যাশায়ী, তারপর তিনি মারাও গেলেন মেসোমশাই হাইস্কুলে ঢোকার পরেই| হাইস্কুলটি বাড়ির থেকে কয়েক মিনিটের পথ| ছোটবোনের বয়স এদিকে মোটে পাঁচ| একা থাকা নিরাপদ নয়, অথচ তাকে দেখাশোনার জন্য কাউকে বহাল করার উপায়ও নেই; তাই একটি ঘরে বাইরে থেকে হুড়কো লাগিয়ে বোনকে রেখে যেতে হতো| ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে উনি এক দৌড়ে এসে একটু দেখে যেতেন বোনকে, বাথরুমে নিয়ে যেতেন| দুপুরে টিফিনের সময় মেসোমশাই আবার একছুট্টে এসে বোনকে স্নান করিয়ে, ভাত খাইয়ে আবার ঘরে বন্ধ করে ফিরে যেতেন| এই দায়িত্ববোধ তখন বিরল ছিল, এখন তো কল্পনার বাইরে|

তিনি কলকাতায় প্রথম আসেন অনেক ছোটবেলায় এক আত্মীয়ের বিয়েতে| তখন ঝকঝকে ব্রিটিশ আমলের কলকাতা| বৌবাজারে চারতলার ফ্ল্যাট থেকে কলকাতা শহরকে মনে হতো স্বপ্নের রূপসী নগর| তারপর এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এলেন ১৯৪৭-এ ঠিক স্বাধীনতার পরেই| দেখলেন সে এক বিভীষিকাময় কলকাতা! দেশ ভাগের পরে হাহাকারের কলকাতা! অকল্পনীয় ভীড়, মানুষের কান্না, আঁস্তাকুড় আর যথেষ্ট শৌচালয়হীন অসহায় কলকাতা| তখনই ওঁর প্রশ্ন জাগে, এর কী কোনও প্রতিকার নেই?

বর্জ্য আর টয়লেট এই দুই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের দেশের নানান জায়গায় গিয়ে উনি খতিয়ে দেখেছেন; এই ক্ষেত্রে উন্নত নানা দেশের ব্যবস্থাপনা দেখতে গেছেন| আর ডিজাইন বানিয়ে প্যাটেন্ট করলেন ভারতের প্যাটেন্ট অফিসে|
কাউকে শুনেছেন নানান দেশে বেড়াতে গিয়ে কেউ ল্যান্ডফিল দেখতে গেছেন বা সরকারের বর্জ্য দপ্তরে দেখা করতে গেছেন? এটা মেসোমশাইয়ের পক্ষেই সম্ভব|

পূর্ণ শিক্ষার কথা না বললেই নয়| শুধু পুঁথিগত শিক্ষায় মানুষ হওয়া, আর সর্বতোভাবে বড় হওয়ার মধ্যে যে গভীর তফাৎ সেটা উনি বুঝেছিলেন এবং কিছু স্কুলে কিছু কাজও হয়েছে দীর্ঘদিন|

'মার্চ টুগেদার' সংগঠন তৈরি করবার পরিকল্পনা আর অদম্য চেষ্টা করে গেছেন তিনি| দেশের নানান উন্নয়ন প্রকল্পে সাহায্য পাঠানো হতো| মোবাইল ক্লিনিক ভ্যান দেওয়া থেকে অনেক উন্নয়নের কাজে উনি টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন|
নিজের জীবনের গন্ডির মধ্যেও মেসোমশাই ছিলেন চ্যাম্পিয়ন| যেমন রান্নায়, তেমনি সেলাইয়ে, তেমনই অরিগামি আর কার্পেন্ট্রিতে দক্ষতা ছিল| আর সবার প্রতি অগাধ স্নেহ তো সবচেয়ে বড় গুণ, যা তিনি পুরোপুরি দিয়ে গেছেন আজীবন|
কর্মজীবনের সাফল্য মেসোমশাইকে জনকল্যাণ থেকে দূরে রাখতে পারেনি| মোটে ৪৯ বছর বয়সে তাঁর সাফল্যের শিখরে পৌঁছানো সত্ত্বেও সব ছেড়ে দিয়ে নেমে পড়লেন সমাজসেবার কাজে|
সমাজের কাজে প্রতি পদে যে আইনের বেড়াজাল আছে সেটা জানতেন বলেই উনি ওই বয়সে law পাস করলেন| আইনজীবী হবেন বলে নয়, কেবল সমাজসেবা করবেন বলে| আর যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য কম্পিউটার ব্যবহারেও পারদর্শী হয়ে উঠলেন| এমন একজন আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব এবং এই উজ্জ্বল আদর্শ আমাদের পথ দেখাবে নানাভাবে|
গঙ্গা নারায়ণ ঘোষ নামটিই শুধু নয়, আমাদের অনেকের মধ্যে রয়ে গেছে তাঁর অনুপ্রেরণা, সেটিই আমাদের কাছে এক বড় সম্পদ হয়ে থাকবে|
প্রণাম জানাই মেসোমশাইকে|
বলাকা ঘোষাল

Ganga Narayan Ghosh

Ganga Narayan Ghosh was a tireless worker and a truly goal-oriented gentleman. He held a deep love for his motherland, India – especially his beloved city of Kolkata. His passion for making India a cleaner and more sustainable country was unwavering. He wrote extensively on the subject, contributing several insightful articles. In 2023. a book titled 'Towards Zero Waste India' was published by the Houston based social organization, 'March Together'.

Ganga Narayan Ghosh co-founded March Together in 1995, alongside other committed members. Under his vision and leadership, the organization built a lasting legacy of thoughtful, accountable and impactful humanitarian support for those in need. He dedicated significant time to a project in an institution in Barrackpore, where he mentored students in three foundational pillars of service: education, health care and crisis care. His hands-on involvement and guidance left an indelible mark on the community.

I had the privilege of working alongside him for the past thirty-five years – sometimes as a friend, sometimes through spirited debates – but always with deep respect for his dedication and principles. My heartfelt condolences go out to his family.
May his soul rest in peace.

Mrinal Chaudhury

শিল্পী: শ্রীমতী রাণী ঘোষ

গঙ্গাদা

প্রবাস বন্ধু সাহিত্য সভা একজন স্বনির্ভর, নিঃস্বার্থ, জ্ঞানী, নিরলস কর্মী, ও অভীষ্ট লক্ষ্যে নিবেদিত-প্রাণ এক বন্ধু সভ্যকে হারাল! সংসারে ও কর্মজীবনে সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ সফল এক ব্যক্তিত্ব, আমাদের চিরপরিচিত "গঙ্গাদা"| বয়সের সংখ্যার কাছে কখনও হার মানেননি! জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত স্মৃতিশক্তিতে ও আন্তরিকতায় বয়সের সীমাবদ্ধতাকে হার মানিয়েছেন | আমরা তাঁর প্রাণ-প্রাচুর্যের প্রেরণা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হলাম |
বিনম্র শ্রদ্ধায় তাঁর পুণ্য ও পবিত্র আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি |
আমাদের পরম প্রিয় রাণীদিও আমাদের প্রার্থনায় রাইলেন...
ওঁ শান্তি!
অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

শ্রী গঙ্গা নারায়ণ ঘোষ

গঙ্গাদা এবং রাণীদির সাথে দুর্গাবাড়িতে, প্রবাস বন্ধুর সাহিত্য সভায় এবং অনেক নিমন্ত্রণ বাড়িতে বা পার্টিতে আমাদের দেখা হতো। তাঁদের সম্ভাষণ ও ব্যবহার আমাদের মুগ্ধ করত। গঙ্গাদা নিজেকে খুব ব্যস্ত রাখতেন। বহুকিছু করার চেষ্টা করেছেন এবং সফলও হয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি এবং অন্যান্যরা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান 'মার্চ টুগেদার'-এর মাধ্যমে ভারতে গরিব শিশুদের জন্য স্কুল চালাতেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে 'স্যানিটেশন' এবং দেশ উপযোগী আবর্জনা নিষ্কাশণ ব্যবস্থা নিয়ে লিখেছেন এবং চেষ্টা করেছেন যেন তাঁর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়। বিদেশে থাকা সত্ত্বেও দেশের জন্য তাঁর এসব কর্মকান্ড প্রশংসনীয়।

কিছুদিন অসুখে ভোগার পর গঙ্গাদা বলেছিলেন, তাঁর সবকিছু – যেমন কান, চোখ, স্মৃতিশক্তি আগের চেয়ে অনেক ভাল কাজ করছে। শুনে খুব ভাল লেগেছিল। ইদানীং যখন তিনি "আমি চলে যাচ্ছি" বললেন, তা শুনে খুব খারাপ লেগেছিল। ভালকে 'খুব ভাল' বলা আর খারাপ কিছুকে সাহসিকতার সাথে মেনে নেওয়া একজন বিচক্ষণ মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর। তাঁর চলে যাওয়াতে আমরা মর্মাহত। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

ভজেন্দ্র এবং কল্যাণী বর্মন

গঙ্গাদা

গঙ্গাদাকে আমি কয়েকবার সাহিত্য সভাতেই দেখেছি। ওটুকুতেই মনে হয়েছিল তিনি নিজেকে নানাভাবে ব্যস্ত রাখতে ভালবাসেন। কলকাতাকে দূষণমুক্ত করার একটা অদম্য ইচ্ছা তাঁর ছিল। অনেকবার কলকাতায় গিয়ে সে ব্যাপারে অনেক কাজও করে এসেছেন। কিন্তু একটা বড় শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা কোনও একজন বা কোনও একক সংস্থার পক্ষে সম্ভব নয়। সেখানে মানুষের নিজস্ব বোধোদয় হওয়া প্রয়োজন। তিনি বরাবর আশা রেখেছেন সেটা হবে – আমরাও তাঁর আশার অংশীদার!

গঙ্গাদার প্রয়াত আত্মার উদ্দেশ্যে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

মালবিকা চ্যাটার্জী

নববর্ষ সংখ্যা

ইতিহাসের পাতা থেকে

সফিক আহমেদ

গত শীতে দিদির সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম লালবাগ, মুর্শিদাবাদে। দিদি জামাইবাবু দুজনেই ডাক্তার। বহু বছর এখানের হাসপাতালে কাজ করার পর রিটায়ার করে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেন।

হাতে সময় খুব কম ছিল, একদিনেই ঝটিকা সফর করে যতটা সম্ভব দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে ফেলতে হবে, তাই দিদি স্থানীয় এক মেডিকেল রিপ্রেসেন্টেটিভকে আমাদের সঙ্গে গাড়িতে থাকতে বলেছিলেন যাতে কম সময়ে জায়গাগুলো দেখে নিতে পারি। এই শহর আমাদের গাড়ির ড্রাইভারেরও খুবই পরিচিত। সে প্রায়ই কলকাতা থেকে মুম্বাইয়ের সাউন্ড রেকর্ডিস্ট্ আর মিউজিশিয়ানদের নিয়ে যায় জিয়াগঞ্জে অরিজিৎ সিং-এর স্টুডিওতে।

সকালে বেরিয়ে আমরা এই দুজনের গাইডেন্সে একে একে মতিঝিল, জগৎ শেঠের বাড়ি, কিরীটেশ্বরী মন্দির, ওয়াসেফ মঞ্জিল, নশিপুর রাজবাড়ি, জাফরগঞ্জ সমাধিক্ষেত্র, আজিমউন্নেসার সমাধি, চক মসজিদ, কাটরা মসজিদ, ইমামবাড়া, হাজারদুয়ারী ইত্যাদি সব দেখে নিলাম।

মেডিকেল রিপ্রেসেন্টেটিভ সবজান্তা; তবু তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও সব জায়গায় সামান্য টাকার বিনিময়ে লোকাল গাইডদের মুখে শুনতে থাকি তাদের মতো করে বোঝানো নবাবী আমলের ইতিহাস আর সংগ্রহ করতে থাকি স্থানীয় বাচ্চাদের হাতে-হাতে-ঘোরা দশটাকা-বিশটাকার টুরিস্ট গাইডের চটি বই। দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে রাত্রে খাওয়ার পর চটি বইগুলোর পাতা ওল্টাতে থাকি আর ঢুকে পড়ি নবাবী আমলের আশ্চর্য জগতে।

আড়াইশো বছর ধরে নবাবী করেন মুর্শিদাবাদের নবাবরা। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে ঔরংজেব যখন সাংঘাতিক অনটনের মধ্যে, ভারতের প্রায় সব প্রদেশ থেকে রাজস্ব বন্ধ, বাংলা তখন একমাত্র ব্যতিক্রমী। বাংলার দেওয়ান করতলব খাঁ প্রতি বছর নিয়ম করে কোটি টাকার উপর রাজস্ব পাঠাচ্ছেন সম্রাটকে। সম্রাটের দেওয়ান বাংলার রাজস্ব আদায়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট করতলব খাঁকে দেন 'মুর্শিদকুলি খাঁ' উপাধি। তাঁর নিজের নামে শহরের নাম রাখার অনুমতিও দেন। ফলে 'মুখসুদাবাদ' হয়েছে 'মুর্শিদাবাদ'। মুর্শিদাবাদ শহরের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই ১৭০৪ সালে। মুর্শিদকুলি রাজত্ব করেন একুশ বছর, সেই সময় নগর গড়ে ওঠে। ঢাকা থেকে দেওয়ানি দপ্তর চলে আসে আর সঙ্গে আসে আমলা, ব্যাঙ্কার, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তাদের বাসস্থান, অফিস, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বিদেশী বণিকরা তখন কাশিমবাজার, ফরাসডাঙ্গা, চন্দননগর, সায়েদাবাদে। তাদের উপর নজরদারি করার জন্য ঢাকার থেকে মুর্শিদাবাদ অনেক সুবিধাজনক। চল্লিশ থাম দিয়ে তৈরী হয় দেওয়ানি দফতর 'চেহেলসেতুন' যেখানে পরে চক মসজিদ তৈরী হয়।

মুর্শিদকুলি খাঁ অল্প সময়ের মধ্যে তৈরী করান এক মসজিদ, যার প্রবেশ-দ্বারের সিঁড়ির নিচে নিজেই তৈরী করান নিজের সমাধিস্থল। তাঁর তৈরী সেই কাটরা মসজিদ এখনো বর্তমান।

কাটরা মসজিদ

মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলার স্বাধীন নবাবীর প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি এক সময় ঢাকা শহরের দেওয়ান ছিলেন, তখন জগৎ শেঠের পূর্বপুরুষ মাণিকচাঁদ ঢাকায় ব্যবসা করতেন। মাণিকচাঁদ মুর্শিদকুলি খাঁর সহায়তায় বাদশাহ ফররোখ শেখের থেকে শেঠ উপাধিতে ভূষিত হন। মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর ভাগ্নে পোষ্যপুত্র ফতেচাঁদ সর্বপ্রথম জগৎ শেঠ উপাধি পায়। তখনকার দিনে শেঠদের থেকে নবাবরা, দেশি জমিদাররা, ইংরেজ আর ফরাসি বণিকরা, অর্থ ঋণ নিতেন।

হিন্দু-মুসলমান সব প্রজাদের কাছেই প্রিয় ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। সারা জীবন এত ধনসম্পত্তি ও আড়ম্বরে জীবন কাটিয়ে বৃদ্ধ বয়সে কাটরা মসজিদের সিঁড়ির নিচে তাঁর নিজের

তৈরী কবরখানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ধারণা ছিল মৃত্যুর পর সিঁড়ির তলায় সমাধিস্থ হলে বহু মানুষের পদধূলি পড়ে তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করবে।

১৭২৫ সালে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর নবাব হন তাঁর একমাত্র জামাতা সুজাউদ্দিন। শৌখিন নবাব ছিলেন তিনি। তাঁকে মুর্শিদাবাদের শাহজাহান বলা হতো। সাহিত্য ও সঙ্গীতে তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। লখনৌয়ের মতো তিনিও তৈরী করেছিলেন মার্গসঙ্গীতের ঘরানা। তিনি ছিলেন উদার ও অথিতিপরায়ণ; জ্ঞানী-গুণী পন্ডিত ও শিল্পীদের সম্মান করতেন। তিনি তৈরী করান শাহী মঞ্জিল, শাহী দরওয়াজা, দরবারি আম, খিলায়াৎখানা, ফারহাবাগ, রোশনিবাগ, ত্রিপোলিয়া নহবৎখানা গেট। চক মসজিদের সামনে ত্রিপোলিয়া নহবৎখানা গেট আর রোশনিবাগে মুর্শিদাবাদের সবচেয়ে বড় নিজের সমাধি আর মসজিদ ছাড়া সবই কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে। ১৭৩৯ সালে নবাব সুজাউদ্দিন মারা যান।

চক মসজিদ

নবাব সরফরাজ খাঁ পিতা সুজাউদ্দিন ও মাতামহ মুর্শিদকুলি খাঁর অযোগ্য উত্তরসূরি। মাত্র এক বছর রাজত্ব করে হারেমে পনেরোশো বেগম, মসজিদে একশো বেতনভোগী মোল্লা তৈরী করেন। অবশ্য মুর্শিদাবাদে তিনিই একমাত্র নবাব, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন। ১৭৪০ সালে তিনি গিরিয়ার যুদ্ধে আলীবর্দীর কাছে পরাজিত ও নিহত হন। বিশ্বাসঘাতকতা করে সরফরাজকে পরাজিত ও হত্যা করেন আলীবর্দী।

নবাব আলীবর্দীর প্রজাপালন, একনিষ্ঠ কর্তব্যবোধ, ও টানা ন'বছর বর্গী দমনের চেষ্টা অনবদ্য; তাই বাংলার প্রজারা মনে রাখেনি তাঁর সিংহাসনে বসার কলঙ্ক-কাহিনী। আফগান আর বর্গীদমন করতে করতে আলীবর্দীর রাজত্বের দীর্ঘ সময় চলে যায়। তিনি বিলাসপ্রিয় বা শৌখিন নবাবের তালিকায় পড়েন না। সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। বহু-নারী ও সুরাপানের বিরোধী ছিলেন। নিজে রান্না করতে, পরিবারের সঙ্গে একসাথে বসে খেতে ও নামাজ পড়তে পছন্দ করতেন। নিজের জন্য কোনো প্রাসাদ তিনি বানাননি। অবশ্য নাতি সিরাজউদ্দৌল্লাকে মনসুরগঞ্জ প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন। ১৭৫৬ সালে আলীবর্দী মারা যান।

১৭৫৬ সালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হলেন আলীবর্দী খাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লা। সিরাজউদ্দৌল্লার দুই বেগম লুৎফুন্নেসা ও ওমাতুন্নেসা। লুৎফুন্নেসা নবাব আলীবর্দী খাঁর হারেমে ক্রীতদাসী ছিলেন কিন্তু সিরাজ তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বেগমরূপে গ্রহণ করেন। পলাশীর যুদ্ধে পলাতক অবস্থায় সিরাজ ধরা পড়লে লুৎফুন্নেসা তাঁকে উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা যোগায়। খোশবাগে তাঁর সমাধি আছে। সিরাজউদ্দৌল্লা মুঘল বাদশা শাহজাহানের মতো শৌখিন আর আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। বহু অর্থব্যয়ে হীরাঝিল প্রাসাদ বানিয়েছিলেন আর দাদু আলীবর্দী খাঁকে গৃহপ্রবেশে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি দাদুকে হীরাঝিলে আটক করেন এবং পাঁচলক্ষ টাকা মুক্তিপণ হিসাবে গ্রহণ করার পর তাঁকে মুক্তি দেন। ওই অর্থ দিয়ে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে জনৈক সুন্দরীকে কিনে নেন। পরে সিরাজের এক ভগ্নিপতির সাথে রূপবতী তন্বীর অবৈধ মেলামেশায় সন্দিহান হয়ে সিরাজ সেই তন্বীকে জ্যান্ত কবর দেন।

ইংরেজ বণিকরা সেসময়ে এদেশে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে তৎপর। তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হওয়ায় সব সময় সুরাপান আর হারেমে ব্যস্ত থাকতেন। অন্যদিকে বিরুদ্ধ গোষ্ঠী রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ, উমিচাঁদ, মীরজাফর ও ঘসেটি বেগম একসাথে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। মীরজাফর নবাব আলীবর্দী খাঁর জীবদ্দশায় সিংহাসন দখল করার চেষ্টা করে বিফল হন। পরে আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুশয্যায় সিরাজউদ্দৌল্লাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করবেন ও বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি পালন করেননি তিনি।

সিরাজউদ্দৌল্লা ছিলেন তেজস্বী, সত্যবাদী ও সরল; তবে যুদ্ধবিগ্রহে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন | তিনি প্রকাশ্য রাজপথে হোসেনকুলী খাঁকে হত্যা করেন, জগৎ শেঠকে নিজ দরবারে চপেটাঘাত করেন এবং ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেন, নিজ মাসিমা ঘসেটি বেগমকে নজরবন্দি করে রেখে প্রচুর অর্থ অপহরণ করেন, এমনকি রাজবল্লভকে তহবিল তছরুপের দায়ে বন্দি করেন | তিনি মোহনলালকে প্রধানমন্ত্রী আর মীর মদনকে প্রধানরক্ষী করেন | গুপ্তচর বিভাগে বহু অপটু ও অকর্মণ্য লোক ছিল, নিজে রাজকার্য পরিচালনা করতেন না, ফলে ষড়যন্ত্রকারীদের কুচক্রান্তে ও মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বহু সৈন্যসামন্ত, কামান, গোলাবারুদ, দেওয়ান রায়দুর্লভ, মোহনলাল প্রভৃতি অনুচর থাকা সত্ত্বেও ২৯শে জুন, ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন | যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পত্নী লুৎফুন্নেসা, কন্যা উম্মাত জহুরা ও বিশ্বাসী খোজাকে নিয়ে পাটনা চলে যাওয়ার পথে ভগোবাঙ্গলায় ডাঁসা ফকিরের চক্রান্তে ধরা পড়ে যান | মীরজাফরের পুত্র, মিরন মোহম্মাদী বেগকে দিয়ে সিরাজকে হত্যা করান; যদিও মিরন সিরাজউদ্দৌল্লার বাল্যবন্ধু ছিলেন | আর মোহাম্মদী বেগ তাঁরই অন্তঃপুরে আশ্রিত ও প্রতিপালিত হয়েছিল | এই দুজন হত্যাকারী সিরাজকে হত্যার পর তাঁর মৃতদেহ হাতির পিঠে চড়িয়ে সারা শহর পরিক্রমা করিয়েছিল |

সিরাজউদ্দৌল্লার পর নবাব হন মীরজাফর | আলীবর্দীর বৈমাত্রেয় বোন শাহ খানমের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে জাফরগঞ্জে শাহ খানমের বাড়িতেই থাকতেন মীরজাফর | পলাশী যুদ্ধের পর নবাব হয়ে সিরাজউদ্দৌল্লার মনসুরগঞ্জ প্রাসাদ বা হীরাঝিলে থাকতেন | মীরজাফরই মুর্শিদাবাদের একমাত্র নবাব যিনি দুবার নবাব হয়েছেন, প্রথমবার ১৭৫৭-৬০ আর দ্বিতীয়বার ১৭৬৩-৬৫ সাল | ১৭৬০-৬৩ নবাব ছিলেন মীরজাফরের জামাই মীরকাসিম |

মীরজাফরের পর যথাক্রমে নাজিমউদ্দৌল্লা, সইফউদ্দৌল্লা, মোবারকউদৌল্লা, বাবর আলী, আলী জা, ওয়ালা জা একে একে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে এসেছিলেন | ইংরেজদের দেওয়া বৃত্তি নিয়ে রাজকার্য চালিয়েছেন তাঁরা | ১৮২৪ সালে নবাব নাজিম হলেন হুমায়ুন জা | তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৩ বছর | ২৩শে ডিসেম্বর সকাল দশটায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে বসলেন হুমায়ুন জা | নবাব হুমায়ুন জা ইংরেজ সরকারের থেকে বছরে ষোললক্ষ টাকা বৃত্তি পেতেন | এই নবাবের অমর কীর্তি হাজারদুয়ারী | হাজারদুয়ারী প্যালেসের একহাজার দরজার মধ্যে ১০০টি নকল | বাকি দরজাগুলো খোলা

হাজারদুয়ারী প্যালেস

বন্ধ করা হয় একটা চাবি দিয়েই | প্যালেসের মধ্যে বিখ্যাত হ'ল দরবার কক্ষ, লাইব্রেরি ও অস্ত্রাগার | প্রতি কক্ষে পাশ্চাত্য শিল্পীদের আঁকা তৈলচিত্র, জড়োয়ার কার্পেট, পশমের আর ধাতব জিনিসপত্র, আসবাবপত্র আর হাতির দাঁতের খেলনা শোভা পায় | বিখ্যাত তৈলচিত্র 'দ্য ব্যারিয়াল অফ স্যার জন মোর', 'আদম অ্যান্ড ইভ', 'সেইন্ট মেরি' এখানে শোভা পায় | দু'তলায় দরবার কক্ষ, দিনের বেলায় কোনো আলো না জ্বললেও স্বাভাবিক আলোতে আলোকমন্ডিত হয় | প্যালেসের সামনের গ্র্যান্ড স্টেয়ারকেসটি অত্যন্ত সুন্দর | এক তলায় আছে প্যালেসের অস্ত্রাগারে রক্ষিত পলাশীর যুদ্ধের সব অস্ত্রসস্ত্র | ১৮৯২ সালের ১৩ই নভেম্বর নবাব হুমায়ুন জা পরলোকগমন করেন |

তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র ফেরাদুন জা মসনদে বসেন | শোনা যায় নবাব ফেরাদুন জার ২০টি বেগম ছিল এবং পুত্র কন্যা ছিল ১০১ জন | তাঁর মৃত্যুকালে ১৯টি পুত্র ও ২২টি কন্যা জীবিত ছিল | এই সময় কাঠের ইমামবাড়া পুড়ে গেলে ১৮৪৭ সালে বর্তমান ইমামবাড়াটি তৈরী হয় | ফেরাদুন জার সময় থেকেই মুর্শিদাবাদের নবাবদের গৌরব ম্লান হতে থাকে | এই সময় ইংরেজ গভর্নমেন্ট তাঁর মাসিক বৃত্তি কমিয়ে দেয় | তিনি ইংল্যান্ডে স্টেট সেক্রেটারির কাছে গিয়েও কোনো সুফল পাননি | ১৮৫২ সালে লর্ড ডালহৌসি তাঁর বৃত্তি একেবারে বন্ধ করে দেন | প্রতিবাদে তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার 'নবাব নাজিম' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন | তিনি হয়ে যান সর্বশেষ নবাব

নাজিম। ফেরাদুন জা দুজন ইউরোপিয়ান মহিলার পাণিগ্রহণ করেছিলেন; সেই বেগমদের নামকরণ হয় সেরা বেগম ও মোহাম্মদী বেগম।

নবাবের মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ আরব দেশে প্রেরিত হয়।

নবাব ফেরাদুন জার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হিজ হাইনেস 'ওয়াসিফ কদর সৈয়দ আসিফ আলী মির্জা মহরত জঙ্গ, আমির উল ওমরা, GCIE, নবাব বাহাদুর অফ মুর্শিদাবাদ' নবাব হন। 'নবাব নাজিম' উপাধি লোপ পাওয়ায় তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব নামে পরিচিত হলেন। এই নবাব খুব বদ-মেজাজি ছিলেন। তাঁর একটা পা খোঁড়া ছিল বলে পালকি চড়ে দরবারে যেতেন। কখনো কখনো অনেক ঘোড়াবিশিষ্ট সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়িতে নগর ভ্রমণে বেরোতেন। তাঁর দেওয়ান ছিল ফজলে রাব্বি আর প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন বাবু জানকি নাথ পাণ্ডে। এই নবাবের ভূমিকম্পে আতঙ্ক ছিল; তাই এক ফাঁকা জায়গায় খুবই সুসজ্জিত আটচালা ঘর বানিয়ে বাস করতেন।

১৯০৬ সালে নবাবের মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ ইরাকে প্রেরিত হয়।

নবাব হাসান আলীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সৈয়দ ওয়াসেফ আলী মির্জা নবাব হন। তাঁর প্রকৃত খেতাব ছিল হিজ হাইনেস 'স্যার সৈয়দ ওয়াসেফ আলী মির্জা ককসিকোভ খান বাহাদুর মহব্বত জঙ্গ, আমির উল ওমরা, রইসউদ্দৌল্লা, সুজা উল মূলক, নবাব বাহাদুর অফ মুর্শিদাবাদ'। তাঁর আমলে লর্ড কার্জন মুর্শিদাবাদের কালাই উপজেলায় যান। খুব শৌখিন ছিলেন এই নবাব। তিনি কেল্লা, হাজারদুয়ারী প্যালেস, নিজের নামে নির্মিত ওয়াসেফ মঞ্জিল প্যালেস এবং পাশাপাশি এলাকায়

ওয়াসেফ মঞ্জিল প্যালেস

নিজস্ব পাওয়ার হাউস থেকে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করেন। একটি স্টীমারে ভ্রমণ করতেন তিনি, শিকারের সখ ছিল, শীতের সময় বজরা ভ্রমণে যেতেন, মাঝিমাল্লার গান ও ঘুঙুর পায়ে নাচ তাঁর আনন্দ বর্ধন করত।

নবাব ওয়াসেফ আলী লন্ডন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন; উর্দু, ফরাসি, ও ইংরেজি ভাষায় ছিলেন সুপন্ডিত। তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার প্রয়োগ দেখা যায় তাঁর লেখা 'এ মাইন্ড রিপ্রোডাকশন' বইতে। নবাব জীবনে অনেক দুঃখ, আঘাত পেয়েছেন, আশাভঙ্গ হয়েছে অনেকবার; তার প্রভাব আছে এই বইয়ে। ধর্মসংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে লেখা এই কবিতা কণিকা। এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লেখেন জাতীয়তাবাদী, রবীন্দ্র অনুরাগী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সুধী সমাজে এই কাব্যগ্রন্থ খুবই সমাদৃত হয়।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদে হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি কনফারেন্স নামক বিরাট জনসমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। এই সময় তিনি শ্বেত পোশাকে শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করে ওয়াসেফ মঞ্জিল প্যালেস থেকে কনফারেন্সে যোগদান করতে যান। দেশ বিভাগের পর হাজারদুয়ারী প্যালেসের সামনে বিরাট জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী। অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষাবিদ, রাজা, জমিদার জোতদার ও ব্যবসায়ীরা যোগ দেন। দেশ বিভাগের পর এই মুর্শিদাবাদ শহরে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা দানা বাঁধতে পারেনি শুধুমাত্র নবাব ওয়াসেফ আলী মির্জার উদার নীতির জন্য।

কলকাতায় যখন সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট বুলগানিন ও প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ ভারত দর্শনে আসেন সরকারি অথিতি হিসাবে নবাব আমন্ত্রিত হন এই সভায়। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু কলকাতায় পার্ক স্ট্রিটে এক জনসভায় ভাষণ শেষে সামনে নবাব বাহাদুরকে দেখে উপস্থিত শ্রোতাদের তাঁর আদর্শ ও নীতিকে অনুসরণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে অনুরোধ করেন।

নবাব খেলাধুলাতেও ছিলেন উৎসাহী। নিজে ভাল পোলো আর টেনিস খেলতেন। খেলার সঙ্গে শরীরচর্চাও করতেন। বিখ্যাত গামা পালোয়ানসহ আরো নামজাদা কুস্তি-গিররা নবাবের কুস্তির আখড়ায় আসতেন।

নবাব প্রতিদিন হারেমে গোলাপজলে স্নান করতেন, গায়ে মাখতেন শামীম ওয়াসফি ও রূহে চামেলী। নামকরা খলিফার হাতে কাজ করা হীরা-মুক্ত-পান্নাখচিত উষ্ণীষধারী দুধসাদা ছোট শেরওয়ানি শাহী পোশাকে দিল্লির দরবারে তাঁর উপস্থিতি উজ্জ্বল হয়ে থাকত। নবাব চুল-দাড়ি-গোঁফের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন, সখ ছিল চুলে ও গোঁফে কলপ দেওয়া ও মেহেন্দি লাগানো। কলকাতায় থাকাকালীন মাসে দুবার একজন নাপিত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় যেত নবাবের চুল-দাড়ি-গোঁফের সাজসজ্জার জন্য।

মুর্শিদাবাদের আম খুবই বিখ্যাত। আমের সময় আম্বাখানায় কর্ম-তৎপরতা বেড়ে যেত। আমবাগান দেখাশোনা করার জন্য আস্তাবলের অনেক কর্মীকে আম্বাখানায় বা আমবাগানে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। আম্বাখানায় বাগানের সেরা আমগুলোর বিশেষ পরিচর্যা করা হতো। সময় দেখে দেখে তাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হতো। আমে ঠিকমতো হাওয়া লাগছে কিনা, রঙ ধরল কিনা, খাওয়ার উপযুক্ত হ'ল কিনা দেখার জন্য কর্মীরা থাকত। ভারতের গভর্নর জেনারেল, সেনা প্রধান, সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের আম পাঠানোর একটা ঐতিহ্য ছিল নবাবী আমলে। মুর্শিদাবাদের আম কখনো সিমলায় গ্রীষ্মাবাসে, কখনো দার্জিলিঙে পাঠানো হতো। নবাব নিজেও আম খেতে পছন্দ করতেন। 'নবাব পসন্দ', 'চম্পা' আম নবাবের প্রিয় ছিল। অভিজ্ঞ চাকর কোহিতুর আম সযত্নে তুলোর ভিতর রেখে দিত। প্রতিদিন তিনঘন্টা অন্তর আম পরীক্ষা করা হতো। জলখাবারের সময় উপযুক্ত আম এনে আমের উপর দিক আর নিচের অংশ বাদ দিয়ে শুধু মাঝের আধ ইঞ্চি সারটুকু নবাবকে কেটে দেওয়া হতো। নবাবকে যিনি আম কেটে খাওয়াতেন তাঁকে 'আমতারস' বলা হতো।

নবাব খাদ্যরসিক ছিলেন – ইংলিশ আর হিদুস্তানী খানার জন্য দুজন বাবুর্চি ছিল। কাবাব, কোফতা, কালিয়া, কাবুলি বিরিয়ানি, পোলাও, জর্দা পোলাও নবাবের প্রতিদিনের খাবার ছিল। বাদাম, পেস্তা, আখরোট, কিসমিস, জায়ফল, জয়িত্রী নানারকম মশলা দিয়ে তৈরী হতো পোলাও। নবাবের প্রিয় পদ ছিল মাছের দম পোক্ত, রান্না করা গোটা মাছ চামচে কেটে মুখে দিলেই গলে যায়। প্রতিদিন আশি রকম পদ নবাবের জন্য রান্না হতো। আশিটা বাটিতে সেই খাবার বিশেষ আলমারিতে তালা বন্ধ অবস্থায় থাকত। উচ্চপদস্থ কর্মচারী থাকত খাবার তত্ত্বাবধানে। নবাবের পার্সোনাল সেক্রেটারি ছিলেন ইন্দ্রমোহন রায়। তখন নবাবের জন্য প্রতিদিন ষোলটাকা সের দরে আধসের টাটকা মালাই বরাদ্দ ছিল। নবাব সেই আধসের মালাই থেকে মাত্র এক চামচ তুলে নিয়ে খেতেন পনেরো-কুড়ি মিনিট ধরে। ইন্দ্রমোহন রায় নবাবকে অনুরোধ করেছিলেন মালাইয়ের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দেওয়া যায় কিনা। নবাব বলেছিলেন "ইন্দ্রমোহন, তুমি আজ আমার খাবার দিকে তাকালে, আমার খোরাকি কমিয়ে দিলে আমি আর বাঁচব না।" ইন্দ্রমোহন করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন।

নবাব ওয়াসেফ আলী মির্জার ছিল প্রবল জাতীয়তাবোধ; ত্রিশ দশকের শেষদিকে সারা বাংলাদেশ যখন সাম্প্রদায়িক বিষে বিষাক্ত – কলকাতা, ঢাকা, বরিশাল, খুলনায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চলছে, কলকাতা সহজেই দাঙ্গা বিধ্বস্ত, সে সময়ে নবাবের প্রভাবে মুর্শিদাবাদ ছিল এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত এক প্রীতির শহর। নবাবী আমলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কখনো স্পর্শ করতে পারেনি এই মুর্শিদাবাদ শহরকে।
ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় ছিলেন নবাবের গৃহচিৎসক।

দেশ বিভাগের সময় মুসলিম লীগের দাবি ছিল কান্দি মহকুমা বাদে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হোক। কংগ্রেস চেয়েছিল ভৌগোলিক যুক্তিতে সারা মুর্শিদাবাদ জেলার ভারতে অন্তর্ভুক্তি। ১৯৪৭ সালে ১৫ই অগাস্ট যখন ভারত স্বাধীন হয় তখন মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তিনদিন পর ১৮ই অগাস্ট মুর্শিদাবাদ ভারতের মধ্যে ফিরে আসে। অনেকেই এর পিছনে নবাব ওয়াসেফ আলীর প্রভাবের ছায়া দেখতে পান। নবাব ওয়াসেফ আলী মির্জা ১৯৫৯ সালে কলকাতায় মারা যান। কলকাতা থেকে তার মরদেহ মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়ে জাফরগঞ্জের সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করা হয়।

মুর্শিদাবাদ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী হওয়ার সুবাদে নানা বর্ণের মানুষ সেখানে আস্তানা গেড়েছে। নানা সংস্কৃতির নানা ধারা এসে মিশেছে এই শহরে। তৈরী হয়েছে এক মিশ্র সংস্কৃতি। এই মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব নবাবদের উপরেও পড়ে। তাই কোনো নবাব মতিঝিলে, কোনো নবাব হীরাঝিলের প্রাসাদে হোলি উৎসবে মেতে ওঠেন। মহরমের সময় হিন্দুরাও মহরম পালন করেন। দরগায় মদিনায় হিন্দুরা ঘোড়া সিন্নি দিচ্ছে

এ দৃশ্য মুর্শিদাবাদে আজও দেখা যায় | নবাবী আমলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অটুট ধারা আজ প্রবহমান ভাগীরথীর স্রোতের মতন |

নবাবী আমলের মুর্শিদাবাদ

আড়াইশো বছরের নবাবী আমলের ইতিহাসের পাঠ নিই দুস্থ ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে বিক্রি হওয়া চটি বইগুলি থেকে | আর চেষ্টা করি পাঠক শ্রোতাদের কাছে নবাবী আমলের এক ঝলক পৌঁছে দিতে | এই বইয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার জন্য কোনো লেখকের নাম নেই, সকলেই সম্পাদক | তবুও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব তাঁদের কাছে যাঁদের নাম আছে এই বইয়ের গ্রন্থসূত্র তালিকায় |

(১) সুবে বাংলার শেষ নাজিম: ডঃ রামপ্রসাদ পাল

(২) প্রসঙ্গ শহর মুর্শিদাবাদ: ডঃ রামপ্রসাদ পাল

(৩) মুর্শিদাবাদ নবাব ও নবাবী: ফজলুল হক

(৪) হাজারদুয়ারীর নবাব: শ্যামল দাস

(৫) ভ্রমণে কুইজে ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ: ডঃ রামপ্রসাদ পাল, শান্তনু বিশ্বাস

বর্ণপরিচয়-এর জন্মদিন

চিত্ত ঘোষ

"বর্ণপরিচয়" বাংলার সবচেয়ে আদরণীয় বই | পৃথিবীতে এমন কোনো বাঙালি নেই, যিনি এই বইয়ের নাম শোনেননি | শিক্ষার নতুন ধারায় হয়তো এই বই কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত এই বইয়ের মান ও কদর আজও এতটুকু কমেনি! সন্তানের বিদ্যাশিক্ষায়, সরস্বতী পূজায় এখনও বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় এক পূজা-উপকরণ!

বর্ণপরিচয় প্রাথমিক স্তরের শিশুশিক্ষা গ্রন্থ | শিশুদের বাংলাভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটিই প্রথম | ১৮৫৫ সালে ১৩ই এপ্রিল বিদ্যাসাগর রচিত বর্ণপরিচয় গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় | সেই সময় থেকে অদ্যাবধি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ হিসেবে এটি উভয় বাংলায় সমান গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে আসছে |

গ্রন্থটির প্রথম ভাগে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জণবর্ণ এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যগঠন এবং অনুচ্ছেদ আকারে রচিত মোট একুশটি পাঠ আছে |

গ্রন্থটির দ্বিতীয় ভাগে সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহার দ্বারা শব্দ ও বাক্য গঠন, নানা শব্দসৃষ্টি, অঙ্কে ও কথায় সংখ্যা গণনা এবং উপদেশধর্মী ছোট ছোট রচনা মিলে মোট দশটি পাঠ আছে |

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "শোনা যায়, প্যারীচরণ সরকার এবং বিদ্যাসাগর একদা সিদ্ধান্ত নেন যে, দুজনে ইংরেজি ও বাংলায় বর্ণশিক্ষা বিষয়ক প্রাথমিক পুস্তিকা লিখবেন | তদানুসারে প্যারীচরণ 'First Book of Reading' এবং বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ' প্রকাশ করেন |"

বিহারীলাল সরকারের রচনা থেকে এক অসাধারণ তথ্য জানা যায় যে মফস্বলে স্কুল পরিদর্শনে যাওয়ার সময় "পালকিতে বসে পথেই" বর্ণপরিচয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন বিদ্যাসাগর | ১৮৫৫ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত হয় বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ এবং ওই বছরেই জুনে প্রকাশিত হয় বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ | বিহারীলাল আরও লিখেছেন, "প্রথম প্রকাশে বর্ণপরিচয়ের আদর হয় নাই | ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরাশ হন; কিন্তু ক্রমে ইহার আদর বাড়িতে থাকে |"

প্যারীচরণের ইংরেজি গ্রন্থখানিও বাঙালি সমাজে দীর্ঘকাল আদরের বস্তু ছিল| তবে আজকের বিশ্বায়নের যুগে এই গ্রন্থটির শিক্ষামূল্য কিছুই অবশিষ্ট নেই | অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থটি আজও বাঙালি সমাজে শিশুদের বাংলা শিক্ষার প্রথম সহায়ক বই হয়ে রয়ে গেছে!

এরপর আবারও ১২৫ বছরে কেবল স্বরবর্ণ '৯' ও অন্তস্থ 'ব'-টি ব্যঞ্জন থেকে বাদ গিয়েছে | ফলে বলা যায়, আধুনিক বাংলা বর্ণমালার মূল রূপকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর|

বর্ণপরিচয় যে অত্যন্ত কার্যকর হয়েছিল তা এর কাটতি ও জনপ্রিয়তা দেখেই বোঝা যায় | ১৮৫৫ থেকে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত (১৮৯১) ৩৫ বছরে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ-এর মোট ১৫২টি মুদ্রণ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে|

প্রথম তিন বছরে ১১টি সংস্করণে ৮৮ হাজার কপি মুদ্রিত হয়েছিল| পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য বলা যায়, এ বইয়ের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল ৩ হাজার কপি | এই সংখ্যাকে সেকালের হিসাবে যথেষ্ট বলতে হবে| ১৮৬৭ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত ২৩ বছরে ১২৭টি সংস্করণে এই বই মুদ্রিত হয়েছে ৩৩ লাখ ৬০ হাজার কপি| অর্থাৎ এসময় বছরে গড়ে বর্ণপরিচয় মুদ্রিত হয় ১ লাখ ৪০ হাজার কপি| বলা বাহুল্য, এই কাটতি বা জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারেরও একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে |

১৪ জুন, ১৮৫৫ সাল | প্রকাশিত হয় বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগ | প্রকাশ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় | বর্ণপরিচয় বিদ্যাসাগর রচিত একটি বাংলা বর্ণশিক্ষার প্রাইমারি বা প্রাথমিক পুস্তিকা | দুই ভাগে প্রকাশিত এই পুস্তিকাটির দুটি ভাগই প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৫ সালে| দুই পয়সা মূল্যের এই ক্ষীণকায় পুস্তিকার প্রকাশ বাংলার শিক্ষাজগতে ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা|

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আগে বর্ণমালা শেখার যেসব বই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল তার অধিকাংশই বস্তুতপক্ষে শিশুর বাংলা প্রথম পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না | শ্রীরামপুর মিশনের 'লিপিধারা' (১৮১৫), 'জ্ঞানারুণোদয়' (১৮২০), রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩), 'শিশুবোধক বঙ্গবর্ণমালা' (১৮৩৫), রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'শিশু সেবধি বর্ণমালা' (১৮৪০), স্কুল বুক সোসাইটির 'বর্ণমালা প্রথম ভাগ' (১৮৫৩) ও 'বর্ণমালা দ্বিতীয় ভাগ' (১৮৫৪) বইগুলি জনপ্রিয় হয়নি | বাংলা ভাষাশিক্ষার প্রথম পাঠ হিসেবে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ' (১৮৪৯) বইটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে| তবে সমকালীন ইতিহাসে তথ্য তালাশ করলে মিলবে কয়েক'শ প্রাইমারের কথা| শিশু শিক্ষার এই ধারা শুরু কিন্তু কোনও বাঙালির কীর্তি নয়, সাহেব মিশনারিদের|

বিদ্যাসাগর মহাশয় যা করলেন, তা হ'ল প্রকৃত সংস্কারকের মেধার বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে বাংলা বর্ণমালাকে সংস্কৃত ভাষার অযৌক্তিক শাসনজাল থেকে মুক্তিদান, অবশ্যই যুক্তি ও বাস্তবতা বোধের প্রয়োগে| বহুদিন পর্যন্ত বর্ণমালা ছিল ষোলো স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন... পঞ্চাশ অক্ষরের এই সমাহার | বর্ণপরিচয়ে বেশ কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করেছিলেন বিদ্যাসাগর| ড়, ঢ়, য় সংযোজন করেছিলেন| স্বরবর্ণ থেকে দীর্ঘ ঋ আর দীর্ঘ ৯ বর্ণ দুটি বাদ দিয়েছিলেন তিনি | স্বরবর্ণের তালিকাভুক্ত অনুস্বর এবং বিসর্গকে ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় স্থান দেন | চন্দ্রবিন্দুকে আলাদা ব্যঞ্জন বর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করেন | এছাড়া যুক্তাক্ষর ক্ষ-কে বাদ দেন বর্ণমালা থেকে|

এছাড়াও প্রথম পাঠের এই বইটিতে যুক্ত হয়েছিল একাধিক নতুন বৈশিষ্ট্য | ভাষাশিক্ষার সঙ্গে তিনি পড়ুয়াকে নীতিশিক্ষা এবং মূল্যবোধের পাঠও দিতে চেয়েছিলেন| বর্ণপরিচয়ের দুটি ভাগেই সেভাবে পাঠ্যবস্তু সাজিয়ে ছিলেন তিনি|

গ্রন্থটি যে শুধু বিদ্যাসাগরের জীবৎকালেই সমাদৃত হয়েছিল তা নয়, গ্রন্থপ্রকাশের সার্ধ-শতবর্ষ পরেও এর জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি| পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গ্রন্থটিকে একটি অন্যতম প্রধান গ্রন্থ হিসাবে অনুমোদন করেছেন| পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলকাতা পৌরসংস্থার যৌথ প্রয়াসে কলকাতার কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় ভারতে বৃহত্তম যে বইবাসরটি (বই বিক্রয়ের শপিং মল) নির্মিত হয়েছে (যা অবশ্য বাঙালির চিরাচরিত কর্ম সংস্কৃতির পরম্পরা মেনে আজও অসম্পূর্ণ রয়েছে), তার নামও এই গ্রন্থটির সম্মানে 'বর্ণপরিচয়' রাখা হয়েছে|

দুই পুরুষ

ডাঃ শান্তনু মিত্র

২০২৩ সালের এপ্রিল মাস।

সকাল সাড়ে দশটা। এক ধু ধু মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি নীলনদ পেরিয়ে মিশরের লুক্সর শহরের একদম পশ্চিম প্রান্তে। আমার সামনে আকাশজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল সোনালী বালি পাহাড়ের সারি। নাম Deir El Bahari... সকালের সূর্যের আলোয় যেন ঝলমল করছে এ মাথা থেকে ওই মাথা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই গগনচুম্বী সোনালী প্রাচীর।

দূর থেকে এই বিশাল দেওয়ালের পায়ের কাছে দেখতে পাচ্ছি এক প্রশস্ত মনমোহিনী মন্দির। সকালের আলোয় সেও ঝলমল করছে। একইসঙ্গে ঐ মন্দিরের উপর যেন ছায়ার মতো দেখতে পাচ্ছি বিচারের আশায় আকাশের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক নারীমূর্তি... গত সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের দেড় হাজার বছর আগের কথা। মিশর দেশে তখন রাজত্ব করছেন সে দেশের আঠারো নম্বর রাজবংশের চতুর্থ ফ্যারাও, দুই নম্বর থুতমস, অর্থাৎ থুতমস ২। এই থুতমস ২ তাঁর ১৪/১৫ বছর বয়সে প্রেমের বন্ধনে জড়িয়ে পড়লেন নিজের সমবয়সী এবং নিজেরই সৎবোন, অপরূপ সুন্দরী হাটসেপসুটের সঙ্গে।

তৎকালীন সমাজে বাধা এল না। মহা আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল।

যথা সময়ে বাবা, থুতমস ১-এর মৃত্যুর পর রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন থুতমস ২... বোন থেকে হাটসেপসুট হয়ে গেলেন পাটরাণী।

থুতমস ২-এর সংসার ছিল মোটামুটি শান্তির। যুদ্ধ বা সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে তাঁর খুব বেশি মন ছিল না। বোধহয় শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন বলেই। কিন্তু সুখের অভাব দেখা দিল যখন হাটসেপসুট রাজাকে একটি কন্যা ছাড়া কোনও পুত্র সন্তান দিতে পারলেন না। তাহলে কে হবে যুবরাজ? কাকে রাজদন্ড দিয়ে যাবেন রাজা থুতমস ২? এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েকে তো আর সিংহাসনে বসানো যায় না! তাহলে উপায়?

এই সমস্যার সমাধান করলেন ইসেট নামক এক নারী। এই ইসেট থুতমস ২-এর দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন, নাকি প্রাসাদে হারেমের কর্মী ছিলেন, সে সম্বন্ধে দ্বিমত আছে। কিন্তু তাঁরই গর্ভে জন্ম নিল থুতমস ২-এর একমাত্র পুত্র সন্তান। সেই হ'ল যুবরাজ এবং রাজ সিংহাসনের পরবর্তী অধিকারী।

হাটসেপসুটের রাজমাতা হবার স্বপ্ন কি তাহলে স্বপ্নই থেকে যাবে? তাঁর মনের অবস্থা তখন কী হয়েছিল ইতিহাসে তার কোনও উল্লেখ নেই।

কিন্তু বাস্তব জীবন তো সব সময় সহজ হিসাবে চলে না! এর পর থেকেই থুতমস ২-এর জীবনে ঘটতে লাগল একটার পর একটা অঘটন। তাঁর সব নিকট আত্মীয় একের পর এক বিদায় নিতে শুরু করলেন। অবশেষে তাঁর দু'বছরের শিশু পুত্রকে অনাথ করে থুতমস ২ নিজে এবং শিশুর মা ইসেট দুজনেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। বিশাল রাজপ্রাসাদে সেই শিশুর আপনার বলতে আর কেউ রইল না। একমাত্র ভরসা রইলেন সৎমা, পাটরাণী 'হাটসেপসুট'।

সিংহাসন খালি। হাটসেপসুটের হাতে চলে এল সমস্ত সুযোগ। কিন্তু না। হাটসেপসুট কিন্তু কোনও অন্যায় পদক্ষেপ নিলেন না, নিজের মেয়েকেও কোনো অন্যায্য সুযোগ তিনি দিলেন না। সব দুঃখ-লাঞ্ছনা ভুলে গিয়ে পরম স্নেহে কোলে তুলে নিলেন সেই অসহায় অনাথ শিশুটিকে।

তাকেই অভিষিক্ত করলেন সিংহাসনে। দু'বছর বয়সে সেই শিশু হয়ে গেল থুতমস ৩... কিন্তু রাজত্ব চালানো তো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে অসীম সাহস এবং দৃঢ়তার সঙ্গে রাজদন্ড নিজের হাতে তুলে নিলেন সদ্য বিধবা পাটরাণী, হাটসেপসুট। নিজের বিবেকের দেখানো পথেই নতুন করে জীবনের যাত্রা শুরু করলেন তিনি। একই সঙ্গে মানুষ করতে লাগলেন সেই অনাথ রাজাকে এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে রাজার কর্তব্যও পালন করতে লাগলেন নিজহাতে। এতদিনে হাটসেপসুট এটা বুঝে গিয়েছিলেন যে এই পুরুষতান্ত্রিক জগতে একজন নারীর পক্ষে সমাজের সম্মান আদায় করা কতটা কঠিন। তাই নিজের ঐ অপরূপ সৌন্দর্য ঢাকা দিয়ে হাবেভাবে, পোশাকে, আচরণে

তিনি নিজেকে ঢেকে নিলেন পুরুষের বেশে | পুরুষের বেশ ছাড়া নিজের ঘরের বাইরে আসাও বন্ধ করে দিলেন তিনি | নিঃস্বার্থভাবে সবকিছু করেছেন বলা না গেলেও তখনকার পরিস্থিতিতে কাজটা নিঃসন্দেহে যথাযথ ছিল, কিন্তু সহজ ছিল না | তবু যোগ্য প্রশাসনের মাধ্যমে হাটসেপসুট দেশের উন্নতি করলেন প্রচুর | যুদ্ধ বিগ্রহ না করে দেশটাকে সৌন্দর্যে মুড়ে দিতে চাইলেন তিনি | একটার পর একটা তৈরি হ'ল চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার মতো মন্দির |

সেসব মন্দিরগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হ'ল লুক্সর শহরের কার্নাক মন্দির এবং তাঁর নিজের নামে তৈরি এই বিস্ময়কর মন্দিরটি, Mortuary Temple of Hatshepsut..., এই মুহূর্তে যে মন্দিরের দিকে আমি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি | এইসব সৃষ্টিগুলিতে কিছু না কিছু উপায়ে তাঁর নিজের স্বাক্ষর তিনি রেখেছিলেন | এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যও করেছেন | দক্ষ প্রশাসনে দেশে সুবিচার এনেছেন | আইনমাফিক ফ্যারাও না হয়েও দেশে সুখ-শান্তি ভরিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন এই রাণী হাটসেপসুট | ইতিহাসের পাতায় তাঁর এই কার্যকলাপ আজও স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে |

*****

কেটে গেল ২২ বছর |

একদা অনাথ সেই থুতমস ৩ এখন চব্বিশ বছরের যুবক | কিন্তু দুঃখের বিষয়, বয়স বাড়লেও খুব একটা মনুষ্যত্ব নিয়ে তিনি বড় হলেন না | খুব সম্ভবত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিষময় চক্রান্ত শুরু হয়ে গিয়েছিল কয়েক বছর আগে থেকেই |

পরবর্তী রাজাকে একজন নারীর অধীনে থাকতে হচ্ছে এটা দেশের অনেক পুরুষের কাছেই ছিল পীড়াদায়ক | খুব সম্ভবত থুতমস ৩-কে এরাই বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে ফ্যারাও হয়ে সৎ মায়ের অধীনে থাকা খুবই লজ্জার ব্যপার | তুমি মাকে এবার সরাও |

অবশেষে থুতমস ৩-এর হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে একদিন পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিলেন রাণী হাটসেপসুট | কী কারণে তিনি মারা গিয়েছিলেন সে নিয়ে দ্বিমত আছে |

অনেকের মতে তিনি ভুল করে বিষাক্ত লোশন খেয়ে ফেলেছিলেন | আবার অনেকের মতে যে শিশুকে তিনি এত যত্ন করে মানুষ করেছিলেন তারই হাতে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর | সব প্রমাণই ভাষা ভাষা | কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে আন্দাজ করা যায় যে সেই অকৃতজ্ঞ সমাজে এই স্নেহময়ী, মহীয়সী পাটরাণী হাটসেপসুটের শেষ জীবন কেটেছিল অপরিসীম দুঃখে |

থুতমস ৩ কিন্তু এখানেই থামলেন না | রাজ্যভার হাতে পেয়েই এই নরাধম সৎ মায়ের তৈরি সমস্ত স্থাপত্যগুলি থেকে একের পর এক মুছে-ঘষে তুলে ফেললেন মায়ের স্বাক্ষর | অনেক ক্ষেত্রে সেইসব জায়গাতে সই বসালেন নিজের | কিছু কিছু সৃষ্টি চিরকালের মতো ধ্বংসও করে দিলেন | তাঁর এই বীরত্বের জন্য সে যুগের সমাজের কাছ থেকে হাততালি পেলেও ইতিহাস তাঁকে তাঁর প্রাপ্য স্থানেই জায়গা দিয়েছে |

যে মন্দিরের সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছি এটি হাটসেপসুটের বিখ্যাত সৃষ্টিগুলির একটি | Mortuary Temple of Hatshepsut... বর্তমানে এই মন্দিরটিকে পৃথিবীর অন্যতম চমকপ্রদ স্থাপত্যগুলির মধ্যে একটি বলে গণ্য করা হয় | নিজের সমাধি হিসাবেই হাটসেপসুট এটি তৈরি করেছিলেন | তখন থুতমস ৩-এর বয়স ৭ বছর | এই মন্দিরেই মৃত্যুর পর সমাধিস্থ হতে চেয়েছিলেন হাটসেপসুট | রাজা হয়ে থুতমস ৩ কিন্তু এই সমাধিস্থলে মাকে বিশ্রাম করতে দেননি | তাঁর মমি পাওয়া গিয়েছিল তাঁর বাবা থুতমস ২-এর কবরে |

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম বহুদিন আগের সেই অবিস্মরণীয় সৃষ্টির দিকে | বিশাল সোনালী পাহাড়ের গায়ে মন্দিরের রঙ মিশে সে এক অপরূপ দৃশ্য!

একই সঙ্গে কল্পনার ঘোরে যেন দেখতে পাচ্ছি অপরিসীম বিশ্বাসঘাতকতার শিকার, পুরুষবেশী অপরূপ সুন্দরী মহীয়সী এক নারীর ছবি, রাণী হাটসেপসুট...

তাঁর দু'চোখে যেন জলের ধারা...

The flabbergasted writer in front of
The Mortuary Temple of Hatshepsut at Deir El Bahari, Luxor, Egypt
(Photographs by writer's brother)

বয়স ও ভুলোমন

মৃণাল চৌধুরী

সব মানুষই যে কোনও বয়সে অল্পবিস্তর ভুলে যায়, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ভুলে যাওয়ার মাত্রা কোন কোন ক্ষেত্রে একটু বেশি হয়ে যায়| সেই বিষয়ে অনেক গবেষণা চলছে| হয়তো ফলস্বরূপ এই সমস্যার সমাধান কোনো একদিন হবে, কিন্তু যতদিন না তা হচ্ছে ততদিন আমাদের এর মোকাবিলাও করতে হবে| কীভাবে ও কার জীবনে এমন একটা সময় আসতে পারে কেউ বলতে পারে না|

বয়সের সাথে সাথে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের একটা সম্পর্ক আছে| এটা সবার ক্ষেত্রে যে ঘটে তা নয়| নীরদ সি চৌধুরী থেকে নোয়াম চোমস্কি বা অমর্ত্য সেন এমন অনেকেই ছিলেন এবং আছেন, শুধু তাঁরা কেন, আমাদের পরিচিত বহুজনই তাঁদের বার্ধক্যে স্মরণশক্তির ওপর ভ্রমের থাবা বসাতে দেননি| আমার মনে হয় এটা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই স্বাভাবিক ভুলে যাওয়ার প্রবণতা| বেশিরভাগ মানুষেরই কোনও ঘটনা বা নাম বা আর কিছুতে যদি তেমন আগ্রহ না থাকে তো ভুলে যেতেও বিশেষ সময় লাগে না| সেটা যে কোন বয়সেই প্রযোজ্য| কিন্তু আমি যে কথাটা এখানে বলতে চাইছি সেটা হ'ল ডিমেনশিয়া এবং আলজাইমার; এইগুলোর শিকার হলে জীবনে ধীরে ধীরে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়| যেমন মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন যতটা তাঁর যুগান্তরকারী পদার্থবিদ্যা চর্চার জন্য বিখ্যাত তেমনই তাঁর খ্যাতি আছে প্রাত্যহিক বিষয় গুবলেট করে ফেলার জন্য| তিনটে গল্প বলি –

একবার বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ট্রেনে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন| টিকিট-চেকার এসে টিকিট দেখতে চাইলেন| কিন্তু আইনস্টাইন কিছুতেই টিকিট খুঁজে পাচ্ছিলেন না| শুধু বিড়বিড় করছেন, 'কোথায় যে রাখলাম টিকিটটা!'

চেকার বললেন, 'স্যার, আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি| আপনি নিশ্চয়ই টিকিট কেটেই উঠেছেন| আপনাকে টিকিট দেখাতে হবে না|'

আইনস্টাইন চিন্তিত মুখে বললেন, 'না না! ওটা তো খুঁজে পেতেই হবে! না পেলে জানব কী করে, আমি কোথায় যাচ্ছিলাম!'

আর একটি গল্প –

দিন কয়েকের জন্য এক বড় শহরে বেড়াতে গিয়েছেন আইনস্টাইন| এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে বাসে চেপে হোটেলে ফিরছেন| বাসের কন্ডাক্টর টিকিট চাইলে এ পকেট সে পকেট হাতড়ে কোথাও টিকিট পেলেন না| তিনি খুবই বিব্রতবোধ করতে লাগলেন| কন্ডাক্টর তাঁকে বিব্রত হতে দেখে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনাকে আর ব্যস্ত হতে হবে না| টিকিটটা কোথাও পড়ে গেছে হয়তো|'

এ কথা শুনে আইনস্টাইন বিচলিত হয়ে বললেন, 'আরে না, বলছ কী তুমি! টিকিট না পেলে আমি হোটেলে ফিরব কেমন করে? টিকিটের উল্টোদিকে হোটেলের নাম-ঠিকানা লেখা ছিল যে!

তিন নম্বর গল্পটি হ'ল –

এক সন্ধ্যায় প্রিন্সটনের ডিরেক্টরের বাড়িতে ফোন করে এক ভদ্রলোক আইনস্টাইনের বাড়ির নম্বর জানতে চাইলেন| 'আইনস্টাইনের বাড়ির নম্বর কাউকে জানানো যাবে না' বলে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন ডিরেক্টর|

খানিক পরে আবার ফোন| ওপাশ থেকে শোনা গেল, 'আমি আইনস্টাইন বলছি| বাড়ির নম্বর ও রাস্তা দুটোই ভুলে গেছি| দয়া করে যদি একটু বলে দেন|'

ভুলোমনা আইনস্টাইনের এইসব গল্প কে না জানে! আপেক্ষিক তত্ত্বের জনক বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানী কখনো বাড়ির নম্বর, কখনো বাসের টিকিট হারিয়ে বসতেন| এমনকি মেয়েকে বিয়ে দিতে চার্চে নেওয়ার সময় ৩০ মিনিটের জন্য আসছি বলে ৭ দিনের জন্য হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন| কী এমন হতো যে, অমন জ্ঞানী লোকটি বাড়িঘরের নম্বর ভুলে যেতেন! তবে কি তিনি স্মৃতিভ্রংশ রোগ বা ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন?

ভিক্টর হুগোর কথাই ধরুন – এই বিখ্যাত ফরাসী লেখক একবার ট্রেন থেকে নেমে দেখেন চারদিকে উৎসবের আমেজ| লোকজন হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে অপেক্ষারত| হুগো মনে করলেন, বিখ্যাত কারও জন্য হয়তো অপেক্ষা করছে সবাই| তিনি ভিড় এড়ানোর জন্য উল্টোদিকে নেমে স্টেশনের বাইরে চলে এলেন| এমন সময় দু'তিনজন তাঁকে দেখে হৈহৈ করে এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনি এখানে! আর আমরা সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছি|' হুগোর তখন মনে পড়ে গেল

এখানে এক সাহিত্য সভায় বক্তৃতা দিতে এসেছেন তিনি। তাঁর জন্যই সবার এই অপেক্ষা। বুঝুন অবস্থা!
আমাদের বঙ্গসাহিত্যের কুলশিরোমণি রবীন্দ্রনাথও সত্তর পার করে এই ভুলোমনাদের দলে নাম লিখিয়েছিলেন। 'ভুলোমন' নামে তাঁর একটি ছোটগল্পও আছে। যেখানে তিনি সমাজের প্রচলিত ধারণা ও ব্যক্তিগত অনুভূতির দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন।

স্মৃতি মাঝেমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করে বটে। নিত্যকার ঘটনাগুলো আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। স্মৃতির ওপর স্মৃতি এসে জমা হয়। পুরনো স্মৃতি চাপা পড়ে নতুন স্মৃতির তলায়। খুব বড় ঘটনা ছাড়া দৈনন্দিনের স্মৃতি মুছে যেতে সময় লাগে না।
বয়স বাড়ার সাথে সাথে কিছু জিনিস মনে রাখতে বা মনে করতে একটু বেশি সময় লাগতে পারে, যা বার্ধক্যের একটি স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। হয়তো আপনি গতকাল যার সাথে প্রথম দেখা করেছিলেন তার নাম ভুলে গেছেন। অথবা মনে করতে পারছি না যে আমি আমার ফোনটা কোথায় রেখেছি। অথবা অনেকক্ষণ ধরে আমার চশমাটা খুঁজে যাচ্ছি অথচ সেটা আছে আমার মাথার উপরে। আপনি আপনার চাবি কোথায় রেখেছেন তা ভুলে গেছেন – এগুলো অবশ্যই ডিমেনশিয়ার লক্ষণ নয়।
বর্তমান প্রজন্মে ভুলে যাওয়ার পরিসরটা সব বয়সের মধ্যেই বেড়েছে। এর একটা কারণ 'ইনফরমেশন ওভারলোড'। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের এখন এত কিছু মনে রাখতে হয় যে, অনেক সময়ই খেই হারিয়ে ফেলি। সেখান থেকেই 'ভুলে যাচ্ছি' এই আতঙ্ক তৈরি হয়। তার সঙ্গে জুড়ে বসে মানসিক অবসাদ, স্ট্রেস ও আধুনিক জীবনযাত্রার আরও নানা ব্যাধি। তবে শিশু হোক বা বয়স্ক, সব সময়ে নজরে রাখতে হবে ভুলে যাওয়া আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত করছে কিনা। যদি দেখা যায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমারা বারবার ভুলে যাচ্ছি, তবে অবশ্যই সে ব্যাপারে অতিরিক্ত নজর দেওয়া যুক্তিযুক্ত। শারীরিক দিক থেকে কোনও অসুস্থতা ধরা না পড়লে সেক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যের পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।
বয়সের সাথে সাথে স্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি হ্রাসের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের নাম, তারিখ মনে রাখতে বা নতুন তথ্য শিখতে কিছুটা সমস্যা হতে পারে। তাঁদের কোনও শব্দ মনে রাখতেও সমস্যা হতে পারে, মনে হতে পারে পেটে আসছে কিন্তু কিছুতেই মনে আসছে না, তাঁরা সপ্তাহের দিনটি ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু একটু পরে মনে পড়ে যায়। এই স্মৃতিশক্তি হ্রাস যদি মাঝে মাঝে ঘটে তবে সেটা স্বাভাবিক। বয়স-সম্পর্কিত স্মৃতিশক্তি হ্রাসের লক্ষণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ষাট বছর বয়সের পরে ঘটে।
সুতরাং বলাই বাহুল্য বিস্মৃতি ও স্মৃতিভ্রংশ এক জিনিস নয়। বয়সকালে স্মৃতির সমস্যা ও স্মৃতির ধার বজায় না থাকা দুটোই খুবই স্বাভাবিক। চুলের মতো বয়সের বুদ্ধিতেও পাক ধরে, আবার টাক পড়ার মতো স্মৃতিতেও টাক পড়ে। সুতরাং বেশি বয়সে ভুলোমনা হলে অযথা উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। তাঁরা অচ্ছুৎ নন, অসামাজিকও নন এটা স্মরণে রাখলে ভুলোমনা মানুষরাও দিব্য থাকবেন। মনে রাখতে হবে যাঁরা এই পর্যায়ের মানুষদের সঙ্গে তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁদের অসীম ধৈর্য এবং সহানুভূতির প্রয়োজন।

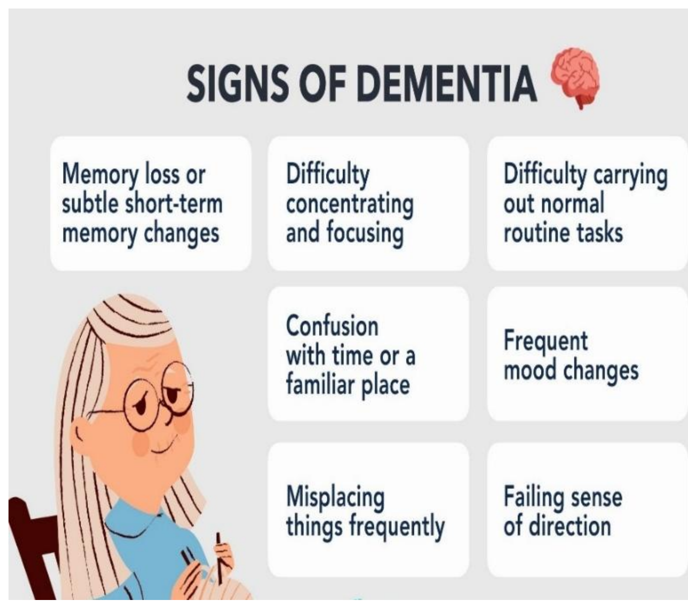

বাবা

আনন্দিতা চৌধুরী

বইয়ের আলমারিটা খুলে একেকটা বই হাতে তোলে অনন্যা। কত যত্ন করে মলাট দিয়ে, মাঝেমাঝে রোদে দিয়ে নিখুঁত অবস্থায় বইগুলোকে রেখেছিলেন বাবা। এর মধ্যে বেশ কিছু বই যথেষ্ট পুরনো – তাঁর নিজের স্কুলে প্রাইজ পাওয়া বইও কিছু আছে। আবার দেখো, আনকোরা নতুন আজকের উঠতি লেখকদের বইও কিনেছেন বাবা, পাশে পেন্সিলের নোট দেখে বোঝা যায় আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন তাদের কাজও।

অবশ্য এতে অবাক হওয়ার সত্যিই কিছু নেই। পুরনোকে আঁকড়ে ধরে নতুনকে বর্জন করে শুধু স্মৃতির চর্বিতচর্বন করে দিনযাপন তো একেবারেই স্বভাবে ছিল না শ্যামলেন্দু রায়ের। দাপটের সঙ্গে ছাত্র পড়িয়েছেন, অবসর কাটিয়েছেন সমান উৎসাহ নিয়ে। পাড়ায় তাদের বাড়িতে প্রথম কম্পিউটার আসে, নিয়মিত চ্যাট করতেন অনন্যার সঙ্গে। স্মার্টফোন এল, সামাজিক মাধ্যমকেও আপন করে নিলেন শ্যামলেন্দুবাবু। নানা বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত সুলিখিত মতামতের গুণগ্রাহী পাঠক অজস্র। অনন্যা ক'দিন আগে একটি পোস্টে বাবার মৃত্যুসংবাদ জানায় সবাইকে। তার উত্তরে অসংখ্য অচেনা মানুষের সমবেদনা ও স্মৃতিচারণ আপ্লুত করেছে তাকে। গত ক'দিনে কত পুরনো ছাত্র, সহকর্মী এসে তার সঙ্গে দেখা করেছে, আশপাশের দুস্থ বাচ্চারা তাদের অবৈতনিক ক্লাসের স্যারের জন্য সকলে মিলে চাঁদা তুলে ফুল নিয়ে এসেছে।

চারদিকে তাকায় অনন্যা। বাবার সাধের এত বই, শখের ডোকরার মূর্তির সংগ্রহ, ছবির অ্যালবাম – কী হবে এইসবের! আর গাছ! বারান্দায়, ঘরে, ছাদে যেসব নানান গাছের যত্নে কেটে যেত বাবার দিনের অনেকটা সময়, সেইসব গাছেরই বা কী হবে! বাবা যখন কয়েক মাসের জন্য তার কাছে গিয়েছিলেন, পাড়ার একটি ছেলেকে গাছপালার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। নিয়মিত ফোন করে খবর নেওয়া, মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও যত্নের অভাবে মরে যায় কিছু গাছ, বাড়ি ফিরে বাবার সে কী আফসোস! এখন কী হবে সেই গাছেদের!

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বিছানায় এসে বসে অনন্যা। মা চলে গেছেন সেই কবে, সে কলেজে পড়ার প্রথমদিকেই। বাবাকে একলা ফেলে বাইরে চলে যেতে তার খুবই দ্বিধা ছিল। বাবাই একপ্রকার জোর করে তাকে দিয়ে ফর্ম ভরিয়েছিলেন, তারপর সুযোগ হাতে আসায় তাকে বিদেশে যেতে বাধ্য করেছিলেন বাবা। সন্তানকে ডানা মেলে উড়তে শেখানোই বাবা-মায়ের কর্তব্য, সে বিশ্বাস বাবার ছিল শেষ অবধি। আর সেই সন্তান যদি বাসা বাঁধে ভিনদেশে, হৃদয় দিয়ে ফেলে এক পরদেশীকে? সন্তানের সেই মনের মানুষ জীবনসাথীকে সাদরে ও সাগ্রহে গ্রহণ করার, স্বাগতম জানানোর উদারতাও ছিল বৈকি বাবার। ডেভিড তো রীতিমত তার শ্বশুরের অনুরাগী, দেশ-বিদেশের রাজনীতি সাহিত্য সঙ্গীত নিয়ে দারুণ আড্ডা জমতো তাদের।

তাঁর অসুখের খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় ছুটে এসেছিল ডেভিড। বাবার অসুখের শেষদিকের খবরই পেয়েছিল তারা। এতদিন ফোনে 'ভাল আছি' ছাড়া কিছুই জানাননি, কারো বোঝা হওয়ার বা কারো বিন্দুমাত্র অসুবিধা সৃষ্টি করার অনিচ্ছা বাবাকে শেষ অবধি চুপ করিয়ে রেখেছিল। শেষমেশ বাবার বন্ধু কমলকাকু জোর করে খবর পাঠান অনন্যাকে।

সময় পেলাম না। সেবা করার, কাছে থাকার, দু'দণ্ড শান্তিতে বসে কথা বলার সময় পেলাম না... বারবার ভাবে অনন্যা। আমার অসুবিধা হবে, কাজের ক্ষতি হবে... এইটুকুই ভাবলে তুমি বাবা! অথচ তোমার চিকিৎসার ভার একা একা তুমি বয়েছ জেনে আমার কতটা অনুশোচনা হবে, সেটা তো ভাবলে না!

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে ফিরে গেছে ডেভিড। এদিকের সবকিছু গুছিয়ে ফেলার জন্য সে রয়ে গেছে আরো কিছুদিন। ফেরার সময় হয়ে এল তারও। অসুখের খবরে এক কথায় ছুটি মঞ্জুর করে দিয়েছিলেন তার বস, কিন্তু সত্যিই কাজ পড়ে আছে প্রচুর। মন মানতে চাক বা না চাক, জীবনটা তার এখন ওদেশেই; এখানে শুধু মাঝে মাঝে আসা।

কিন্তু, আর আসা হবে কী? কার টানে আসবে? এসেই দেখত বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বাবা অপেক্ষা করছেন তার জন্য। এসে পৌঁছানোর পরের সকালেই তার পছন্দের কচুরি, জিলিপি দিয়ে তার ঘুম ভাঙানো, তারপরই সকাল থেকে শুরু হয়ে যেত তার পছন্দের সব রান্নাবান্না। দিনগুলো কাটত একসাথে কলেজ স্ট্রিটে ঘোরা, নতুন বাংলা বইয়ের সঙ্গে অনন্যাকে পরিচয় করানো, আত্মীয়বন্ধুদের ডেকে হৈহুল্লোড়, আবার একদিন কেবল দুজনে বসে মনের কথা, প্রাণের কথা বলা – 'ভাল

আছিস তো রে মা, সত্যি সত্যি ভাল আছিস?' এইসব নানান কথার পিঠে কথা, বাবার মতামত, পরামর্শ পেয়ে কতবার নিজের মনের দ্বিধা-সংশয়, নানা দোলাচলের মীমাংসা করেছে অনন্যা – ডেভিডকে বিয়ে করা বা নিজের চাকরি বদল... যে সিদ্ধান্তই হোক না কেন!

আর তা হবে না। মা-বাবাই তো থাকলেন না, এই ইঁট-কাঠের বাড়ির আর টান কিসের!

তবে হুট করে সে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেবে না কখনও, বাবা তেমনই শেখাতেন চিরকাল। তাই বাড়ি নিয়ে কোনো ফয়সালা সে করতে চায় না এখনই। পরের ক'দিন যায় সবদিক সামলাতে। পছন্দের কিছু বই, মূর্তি ঢোকায় ব্যাগে, পুরনো ছবির অ্যালবামও। বন্ধুদের ডাকে একদিন, যার যা ইচ্ছে নিয়ে যায়। সংসারের জিনিসপত্র দিয়ে দেয় কাজের লোকেদের হাতে। কিছু বই দিয়ে আসে পাড়ার লাইব্রেরিতে। গাছদের স্থান হয় আশপাশের বাড়িগুলোতে, কে জানে কতদিন যত্ন পাবে তারা, কিন্তু এর বেশি সে আর ভেবে উঠতে পারে না।

সবার শেষে বাবার বিছানার পাশ থেকে একটা ছবি তুলে ব্যাগে ভরে অনন্যা। সেইসব দিনের ছবি, যখন তাদের তিনজনের একটা ভরা সংসার ছিল এই বাড়িটাতে। ছবিটি কে তুলেছিলেন মনে নেই, বাবা-মায়ের মাঝখানে বসে আছে অনন্যা, তার প্রথম কলেজে যাওয়ার দিন। তিনজনের মুখে হাসি, চোখে আগামী দিনের স্বপ্ন।

শেষবারের মতো চারদিকে তাকায় অনন্যা। একটা চাবি দিয়ে যাবে কাকার কাছে, মাঝে মাঝে এসে একটু দেখভাল করার জন্য। এখনও যেন বাড়ির আনাচে কানাচে বাবার গন্ধ, বাবার ছোঁয়া লেগে আছে, পরেরবার যখন আসবে তখনও থাকবে কি! সেই পরেরবার যে কবে হবে তাই বা কে জানে! ইচ্ছেই করবে না হয়তো এরপরে আর আসার।

বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে অনন্যা। প্লেনে তার ঠাণ্ডা লাগার ধাত চিরকাল। বাবার গায়ের শালটা হাতব্যাগে নিয়ে নিয়েছে, প্লেনে উঠে গায়ে জড়িয়ে নেবে। ফেরার পথে বাবার ওম লেগে থাকবে তার গায়ে।

নিশীথ বল্লরী

অলোক কুমার চক্রবর্তী

পৃথিবীজুড়ে পাতা আঁচল ভরে ধরিত্রীমাতা নানান পাত্রে থরেবিথরে সাজিয়ে রেখেছেন নানা রত্নসম্পদ। এইরকমই সম্পদভরা একটি পাত্র উত্তর ওড়িশার কেওঞ্ঝর জেলার কিছু অংশ আর তার লাগোয়া সুন্দরগড় জেলার বোনাইগড় (ওড়িয়া উচ্চারণে 'বনেই') সাবডিভিশন জুড়ে। জিওলজিক্যাল তথ্যভাণ্ডারে বা জিওলজিস্টদের কাছে এর নাম 'বোনাই-কেওঞ্ঝর বেসিন', সংক্ষেপিত চালু নাম 'বিকেবি'।

শাল-পিয়াশাল-গামার, মহুয়া-কুসুম-হরতকি-বয়ড়া-অর্জুন-বট ইত্যাদি নানা জাতের বড় বড় গাছ আর অজস্র ধরনের লতাপাতা জড়িয়ে লাল ল্যাটেরাইট মাটিকে ঢেকে সবুজে সবুজ ঘন অরণ্য। আর এই লাল ল্যাটেরাইটই প্রাথমিক ইঙ্গিত দেয় পুরো এলাকা জুড়ে লৌহ আকরিকের বিশাল ভাণ্ডারের। তারই সঙ্গে হাত ধরে চলা অনুজের মতো আছে ম্যাঙ্গানিজ আকরও। শুধু এইটুকু অংশই নয়, আশেপাশের আরও কয়েকটি জেলা জুড়েই রয়েছে 'আয়রন ওর'-এর বিপুল ভাণ্ডার। তবে আলাদা করে বিকেবি-কে মূলত চিহ্নিত করা হয় 'ম্যাঙ্গানিজ ওর'-এর জন্যই। এই ঘন অরণ্যে বনচারী আদিবাসীদের মতোই নিজেদের জন্মগত অধিকার ফলিয়ে আপনমনে ঘুরে বেড়ায় হাতি, ভালুক, হরিণ, বানর, খরগোশ, সজারুর মতো নানা চতুষ্পদের সঙ্গে ময়ূর, টিয়া, হরিয়াল ইত্যাদি অজস্র রকমের পাখপাখালিও।

ব্রিটিশ শাসনের আমলেই বিদেশি কর্তারা সারা ভারত তাঁদের ম্যাপিংয়ের আওতায় এনে ফেলেছিলেন। সাধারণ ম্যাপিং ছাড়াও জিওলজিক্যাল ম্যাপিংও করা হয়েছে প্রাথমিকভাবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতিতে আরও গহন অনুসন্ধানের মাধ্যমে জমির উপরিভাগের (Topography) ভূবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, ড্রিলিং করে বোরহোল থেকে কোর তুলে এনে তার বিশ্লেষণ, আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য exploratory mining ইত্যাদির মাধ্যমে খোঁজ করা ও নিরূপণ করা হচ্ছে খনিজ সম্পদের বিস্তৃতি, তার মান, তার পরিমাণ, উৎখননের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা (commercial viability of exploitation) ইত্যাদি।

কাছাকাছি এলাকায় আমার যাতায়াত ও নানাসময়ে সাময়িক বসবাস সেই শৈশবকাল – ১৯৬০ সাল, আমার ছ'বছর বয়স থেকে | পরে ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে '৮০ দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত চাকরির দৌলতেও আবার এই এলাকাতেই এসেছি | প্রায় সব জায়গাই চেনা | তেমনি চেনা এখানকার ভূমিপুত্র ওড়িয়া আর আদিবাসী সমাজের মানুষজন, তাদের রীতি-রেওয়াজ অনেককিছুই |

বিকেবি ম্যাঙ্গানিজ এক্সপ্লোরেশনের কাজে আমি প্রথমদিকে প্রস্পেক্টিং (জিওলজি) শাখায় থাকলেও পরে চলে এসেছি মাইনিং ডিভিশনে | কেওঞ্ঝরগড় থেকে টেনসা হয়ে রাউরকেলা যাওয়ার পথের ধারে ভদ্রাশাহী চৌক-এর কাছে আমাদের প্রজেক্টের বেস ক্যাম্প করে মোটামুটি ৭৫০-৮০০ বর্গ কিমি-র এক বৃত্তের মধ্যে চার-পাঁচটা স্যাটেলাইট ক্যাম্প স্থাপন করে চলছে ম্যাঙ্গানিজ খোঁজার কাজ | সরকারি স্তরে বিস্তারিত অনুসন্ধান চলার পাশাপাশি ছোটবড় অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল ধরে এই এলাকার নানান পকেটে ছোটখাটো লিজ নিয়ে মাইনিং-এর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে | আমাদের এক স্যাটেলাইট ক্যাম্প আছে বোনাইগড়ের ঘন জঙ্গলের ভেতরে সারকুণ্ডায় | মেন রোড ধরে প্রায় ১৫ কিমি দূরের গুয়ালি মোড়ে গিয়ে বাঁদিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ল্যাটেরিটিক মোরামের রাস্তায় গোটা সাতেক পাহাড়ি নালার খাত পেরিয়ে আরও ২৫ কিমি মতো গেলে তবে আমাদের সারকুণ্ডা ক্যাম্প | ৮-১০ কিলোমিটার বৃত্তের এলাকা জুড়ে এক্সপ্লোরেটরি মাইনিং-এর অঙ্গ হিসেবে চলছে Deep Pitting-এর কাজ | ২.৮X৩.৫ মিটার চওড়া মুখের ১৫ থেকে ২৫ বা ৩০ মিটার গভীর কুয়ো খোঁড়া হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজের স্তরের হদিশ আরও ভালভাবে বোঝার জন্য |

ড্রিলিং, ব্লাস্টিং, গার্ড-টিম্বারিং, গ্যাস টেস্টিং ইত্যাদি কুশলী কাজকর্মের জন্য আমাদের অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ স্থায়ী কর্মচারী, অফিসার, এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি থাকলেও এক্সক্যাভেশন ও মার্কিং, অর্থাৎ ব্লাস্টিং করে ফাটানো পাথর ও মাটি কেটে তোলার কাজটা করানো হয় অকুশলী বা আধা-কুশলী স্থানীয় শ্রমিকদের দিয়েই | এই প্রজেক্টের বিভিন্ন সাইটে প্রায় ৪৫০ স্থানীয় শ্রমিক নেওয়া হয়েছে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে | তবে দৈনিক মজুরিতে অস্থায়ী নিযুক্তি হলেও, এদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, ব্যাড-ক্লাইমেট অ্যালাওয়েন্স, ছুটিছাটা সবই প্রাপ্য হয় | কিন্তু, যেহেতু দৈনিক মজুরির হিসেব, আর সেটাও সরকারি Mines Act অনুযায়ী, তাই রেটও বড্ড খটোমটোভাবে নির্ধারণ করা | ১৯৭০-এর দশক | মাটির ওপরে কাজ করা শ্রমিক, অফিসে কাজ করা অল্পদক্ষ লোক আর ১০ মিটারের নীচে, মানে underground-এ কাজ করা শ্রমিক (তারও Unskilled, Semi-skilled, Skilled ইত্যাদি ভাগ আছে) – মজুরির বিভিন্ন হার | গোটা টাকায় (round figure) হিসেব নয়, তার সঙ্গে পয়সাও আছে | হাজিরার হিসেবে যেমন মাইনের হিসেব দাঁড়ায় কাটাছেঁড়া চেহারায়, তেমনি বিভিন্ন ভাতার হিসেবও আনুপাতিক হারে কমবেশি হয় | এরমধ্যে আবার ইনসেন্টিভ বোনাসও থাকে | এত প্যাঁচঘোঁচের হিসেব লেখাপড়া না জানা স্থানীয় প্রান্তিক ওড়িয়া বা আদিবাসীদের মাথায় ঢোকে না | নানারকম ভুল বোঝাবুঝি | অফিসে কাজ করা শহুরে বাবু (আদিবাসী ভাষায় 'দিকু')-দের বড় সমস্যা হ'ল ভাষা-বিনিময় | একদলের কথা অন্যদল পুরোপুরি বোঝে না | লেগে যায় ঝামেলা | পাঁচহাত ঘুরে হাজিরার রেকর্ড বেসক্যাম্পে পৌঁছে চূড়ান্ত হয় | কোথাও ভ্রান্তি ঘটে যায় | কখনো বা ওরা মনে রাখতে পারে না | ফলে ওদের বেতন দেওয়ার দিনটা এক বিশাল টেনশনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রজেক্টের সবার কাছেই |

এদিকে এই মানুষগুলোর আবার কেন জানি না আমার ওপর ভরসা ও বিশ্বাস অগাধ | ওদের ভাষা ও রীতি-রেওয়াজ জানার জন্য হতে পারে, আবার আমি এই ৪৫০ জনের নাম, বাবার নাম, বাড়ির ঠিকানা সব মনে রাখি, দেখা হলেই নাম ধরে ডেকে ওদের খোঁজখবর নিই – এটাও কারণ হতে পারে | দেখা গেছে, প্রতিটি সাইটেই এইরকম ঝামেলার সময় আমি একবার দাঁড়িয়ে "ঠিক আছে" বলে দিলে, বা "আমি নিজে দেখে ঠিক করে দেব" বলে দিলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে সেটা মেনে নেয় | অনেক সময়ই বাধ্য হয়ে আমাকে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে বুঝিয়ে বলার জন্য | এইসব ঝামেলা এড়াতেই প্রজেক্ট ম্যানেজার মুখার্জিসাহেবের নির্দেশে ওদের পেমেন্টের সময়ে অন্যরা গেলেও আমার উপস্থিতি এবং নিজের হাতে পেমেন্ট করা আমার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে |

এইরকমই সেবার, ১৯৭৯-র জুলাই মাসের কথা | বৃষ্টি-

বাদলার কাল | তবে সেদিন আকাশ মেঘে ঢাকা হলেও বৃষ্টি হচ্ছে না | শিবনাথ একটু অসুস্থ | ওর বদলে আরেক সহকর্মী প্রিয়তোষ দত্তকে নিয়ে সকাল সকালই রওনা দিলাম জিপরূপী রথ নিয়ে পেমেন্ট করতে | সারথি বিদ্যাধর গোপ | কাটাশাহী, চোর মালদা, রয়ডা – এই তিন সাইট ক্যাম্পে পেমেন্ট করতে করতে দুপুর হয়ে গেল | শেষে যাব সারকুণ্ডায় | ভদ্রাশাহী বেসক্যাম্প থেকে বেরিয়ে ওই প্রথম তিনটি সাইট বাঁদিকের রাস্তায়, অল্প দূরে | আর সারকুণ্ডা ডানদিকে, মানে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে, দূরও অনেকটা |

সাইটে খাওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও আমরা সাধারণত নিজেদের খাবার সঙ্গে নিয়েই চলতাম | তখন খবর পাঠানোর জন্য মোবাইল ফোনের সুবিধা তো দূর, টেলিফোনও ছিল না | কাজেই কবে কখন যাওয়া হবে সেটা আগেভাগে জানানো সম্ভব হতো না | তাছাড়া, তখন এত ডাকাতি বা উপদ্রব না থাকলেও টাকাপয়সা নিয়ে যাওয়ার খবরটা নিরাপত্তার কারণেই স্পষ্টভাবে আগাম জানানো হতো না | তবু সাইটের লোকেদের জোরাজুরিতে অনেক সময়ই তড়িঘড়ি ব্যবস্থাপনায় ও অনুরোধের আতিশয্যে ওদের ওখানে খেতে হয়েছে এবং হয় |

গুয়ালি মোড় থেকে সারকুণ্ডার পথে গুয়ালি গ্রাম পেরিয়েই জঙ্গল ঘন হতে শুরু করেছে | শাল আর মহুয়াই বেশি, তবে অন্য বড় বড় গাছও প্রচুর | কাল থেকে বৃষ্টি না হলেও গাছের পাতারা সব ভেজা, প্রচুর জল পেয়ে সতেজ সবুজ | অনেকটা দূরের বোনাইগড় ও টেনসা রেঞ্জের পাহাড়ের

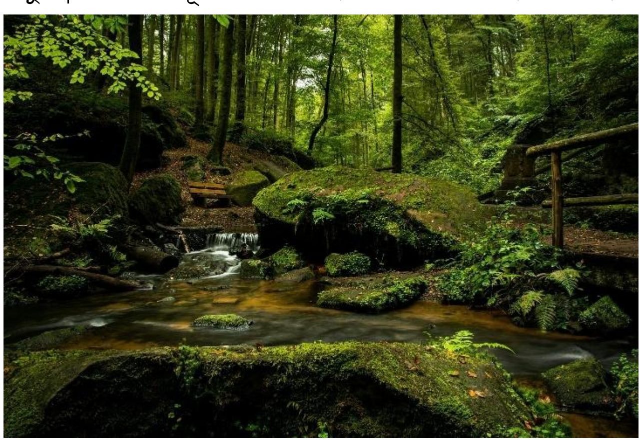

সারি থেকেই কালচে সবুজ এই অরণ্য ঢাল বেয়ে যেন নেমে এসেছে – বিছানো আঁচলের মতো | বর্ষার দিনে জলভরা ভারী মেঘ নেমে এসেছে অনেকটা – পাহাড়সারির গা ছুঁয়ে, তার মাথা প্রায় ঢেকে দিয়ে | এখানকার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হ'ল, কিছুটা পরপরই একটা করে নালার খাত বা কম জলের নালা | গুয়ালি থেকে সারকুণ্ডা অবধি সাতখানা পাহাড়ি নালা পেরোতে হয় | তবে এগুলো অগভীর | বৃষ্টির দরুন এখন প্রতিটিতেই অল্প জল আছে | টানা বৃষ্টিতে নালা বেশ কিছুটা ভরলেও আমাদের ফোর-বাই-ফোর শক্তিশালী জিপ সেইসব জল কাটিয়ে বেশ পার হয়ে যায় | তাছাড়া, আমাদের ড্রাইভাররা সবাই পোড় খাওয়া, দারুণ অভিজ্ঞ | পাহাড়-জঙ্গল-মরুভূমির কঠিন দুর্গম অগম্য পথও এরা হেলায় জয় করে নেয় | সাহসিকতা, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর আমাদের ডিপার্টমেন্টের ড্রাইভারবাহিনী সত্যিই অতুলনীয় |

সারকুণ্ডা ক্যাম্পে পৌঁছাতে প্রায় বিকেল তিনটে বেজে গেল | এখানেই লেবারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি | কাজ মেটাতে বেশ সময় লাগবে | ওখানে পৌঁছেই খবর পেলাম, কাছের এস. লাল কম্পানির বাঙালি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এবং আমার বিশেষ বন্ধু অপূর্ব লাহিড়ি বারবার খবর পাঠিয়েছে, আমাদের বেস ক্যাম্প থেকে গাড়ি, বিশেষ করে আমি, এলেই যেন ওকে একবার খবর দেওয়া হয়, খুব জরুরি দরকার | আমার চেয়ে বছরখানেকের বড়, উত্তর (তখনকার পশ্চিম) দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরের লাহিড়ির সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক অনেকদিন ধরেই, সেই যখন ও শিলজোড়ার এম.এল. রুংটা কম্পানির ম্যাঙ্গানিজ মাইনসে ফোরম্যান হিসেবে কাজ করত | কিছুটা বেশি মাইনে এবং উঁচু পদমর্যাদার হাতছানিতে লাহিড়ি এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় চাকরি নিয়ে চলে এসেছে বছরখানেক হ'ল | শিলজোড়াও প্রত্যন্ত জঙ্গলে, কিন্তু বড় কম্পানির বড় মাইন হওয়াতে যাতায়াতের জন্য মাঝে মাঝে কম্পানির গাড়ি, বা অন্য কিছু না পেলে ঘন ঘন 'ওর ট্রান্সপোর্ট'-এর ট্রাক ইত্যাদি পাওয়া যেত | জায়গাটাও কিছু বড় | কিন্তু সারকুণ্ডায় সেই সুবিধে প্রায় ছিলই না | শিলজোড়ায় থাকতেই ও বিয়ে করেছে বালুরঘাটের সুন্দরী মেয়ে শাশ্বতীকে | নববিবাহিতা স্ত্রীর কাছে নিজের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য একটু উঁচু পদনামের এই চাকরি নেওয়া, স্বাভাবিক | মাইনিং এঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমাধারী হয়ে খুব বড় চাকরি তো পাওয়া সম্ভব নয় | এইরকম বেসরকারি কম্পানিগুলিতেই ঘুরে ফিরে চাকরি বদল করে, নিজের এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট গুনতিতে বাড়িয়ে

যতটুকু উঁচুতে ওঠা যায়।

শাশ্বতী আমার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট, তায় বন্ধুপত্নী, ওদের দুজনেরই জোরাজুরিতে আমি প্রথম থেকেই ওকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছি। সম্পর্কটাও সহজ হয়ে রয়েছে। বালুরঘাট শহর সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য বিখ্যাত এবং ঐতিহ্যময়। ভাল ভাল নাট্য ও সাংস্কৃতিক দল আছে ওখানে। সেই শহরের মেয়ে হওয়াতে নাটক, আবৃত্তি, গান, বইপড়া – এই সমস্তর অভ্যাস এবং ঝোঁক যথেষ্টই ছিল ওর। কিন্তু এইরকম জায়গায় এসে পড়বে ভাবতে পারেনি। দু'পক্ষের কমন আত্মীয়কুলের জোরাজুরিতে বিয়েটা হয়ে গেছে। বাড়ির লোকেরাও জামাইয়ের চাকরির নামটাই শুনেছেন, কেউ আর জায়গাটা যাচাই করেননি। অবশ্য মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি তো, যাচাই করলেই বা কতটুকু আমল দিতেন! মেয়ের বিয়ে হচ্ছে এঞ্জিনিয়ার পাত্রের সঙ্গে, চেনাজানা পরিবার, ব্যস! আর কী চাই?

আমি শিলজোড়ায় থাকতে ওদের বিয়ের পর আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়া থেকে, সময় বার করতে পারলে মাঝে মাঝেই যেতাম ওদের কোয়ার্টারে। বেশ ভাল সময় কাটত দুজনেরই – আবৃত্তি শোনা ও শোনানো, ওর গান শোনা, নাটক নিয়ে গল্প করা ইত্যাদিতে। আমার বইয়ের ভাণ্ডার তো সর্বক্ষণের সঙ্গী; কাজেই আমার কাছ থেকে নানারকম বই পাওয়া শাশ্বতীর একটা বড় প্রাপ্তি ছিল ওই প্রত্যন্ত জায়গাতে। আমি শিলজোড়া ছাড়ার অল্প আগেই লাহিড়ি পরিবার সারকুণ্ডায় চলে গেছে নতুন চাকরি নিয়ে। তখন আমি লম্বা ট্যুরে নাগপুর হেড অফিসে গিয়েছিলাম।

সেদিন আমরা যাওয়ার পর খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই লাহিড়ি এসে হাজির। এখানে প্রায় প্রতি মাসেই তো অন্তত একবার দেখা হয়, তাই আগেও কিছুটা শোনা ছিল; এবার আরও জানলাম, শাশ্বতীর দাদার বিয়ে ঠিক হয়েছে। লাহিড়ি লম্বা ছুটি পাবে না। কিন্তু দাদার বিয়েতে বোনের তো লম্বা সময় নিয়ে যাওয়া খুবই জরুরি। তাই আমাদের গাড়িতে ওকে আমাদের বেসক্যাম্পের কাছের (৭ কিমি) শহর বড়বিলে লাহিড়ির পিসির বাসায় পৌঁছে দিলে ওঁরা কেউ তাকে বালুরঘাটে দিয়ে আসতে পারবেন। আমাদের অফিসের গাড়ি ছাড়া ভরসার এবং সুবিধের আর কী হতে পারে? তার ওপর পুরনো বন্ধু আমি রয়েছি। অতএব...

জিজ্ঞেস করে জানলাম, আমাদের আসার সম্ভাবনায় শাশ্বতী দুদিন ধরে প্রায় তৈরি হয়েই বসে আছে। শুধু নিশ্চিত জানতে পারলেই প্রস্তুতিতে ফিনিশিং টাচটা দিয়ে দেবে। বাড়তি ভাবনার কিছু ছিল না। হয়তো একটু রাত হবে, তবে বড়বিলে পৌঁছে দেব ঠিকই। লাহিড়িকে আশ্বস্ত করে বলে দিলাম শাশ্বতীকে রেডি থাকতে, আমরা ফেরার সময় গাড়িতে তুলে নেব ওকে।

কাজগুলো তাড়াতাড়ি এবং বেশ নির্ঝঞ্ঝাটেই মিটে গেল। কিন্তু প্রিয়তোষ দত্ত বেচারা আটকে গেল স্টোর সংক্রান্ত কিছু কাজের ঝামেলায়। সাইটের স্টক রিটার্নে কিছু বিভ্রান্তি ও গরমিল দেখা দিয়েছে। সেটা না মিটিয়ে ও যেতে পারবে না। আগামীকাল আমাদের ট্রাক আসবে এখানে, প্রিয়তোষ তখন ফিরে যাবে।

কাজ করতে করতেই একটু প্রমাদের আভাস পেলাম যখন ড্রাইভার বিদ্যাধর চিন্তান্বিত মুখে জানাল, "সাহাব, লগতা হ্যায় পাহাড়ি তরফ বারিস হুয়া হ্যায়। উয়ো পানি বহকে আকর অগর নালা ভর দিয়া তো মুসিব্বত হো সকতা হ্যায়।" কিন্তু কিছুই তো করার নেই। কাজ না মিটিয়ে বেরোনোর প্রশ্নই ওঠে না। দেখা যাক। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। বড় বড় গাছপালার ভিড় পার করে এখান থেকে পাহাড়ের সারি চোখে পড়ে না। অপেক্ষা করা ছাড়া কাজ নেই বলে বিদ্যাধর একটু ঘুরতে বেরিয়েছিল বাইরের দিকে। তখনই ওর অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়েছে। তাছাড়া, খুব কাজের এবং বিশ্বস্ত মানুষ বিদ্যাধর নানাদিক থেকেই রসিকজন। দিশি-বিলেতি সবরকম সোমরসে ও যেমন অভ্যস্ত, তেমনি জঙ্গল এলাকায় একদম খাঁটি মহুয়ার মদটাও ও ঠিক খুঁজে পেয়ে যায়। কাজের মধ্যে এদিক সেদিক ঘুরতে ফিরতে ও যে কখন টুক করে কয়েক ঢোঁক মেরে দেয় বোঝাই যায় না। তবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে বিদ্যাধরকে আজ অবধি দেখা যায়নি।

সন্ধে প্রায় ছ'টা নাগাদ আমার কাজ শেষ হতে দেখি ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রেনকোট-গামবুটে সজ্জিত লাহিড়ি বারদুয়েক ঘুরে গেছে। বলাই আছে, যাওয়ার পথে শাশ্বতীকে ব্যাগেজসহ তুলে নেব। ওদিক থেকে এসে সারকুণ্ডা পৌঁছানোর কিছুটা আগে থেকে ডানদিক ধরে সঙ্গ নেয় একটু চওড়া এক পাহাড়ি নালা। উজানের পাহাড় থেকে নামার পর যেখানে তার

সঙ্গে প্রথম দেখা হচ্ছে, সেখান থেকে তার ভাটির স্রোতপথ আরও ডানদিকে ঘুরে গেছে। পাহাড়ি স্রোত তো, যেখান যেখান দিয়ে মাটি কেটে ধুয়ে পথ করে নিতে পারে, সেখান দিয়েই সর্পিল ভঙ্গিতে তার চলার পথ তৈরি করে নেয়। এই নালাটাও অনেকটা সরে গিয়ে আবার ঘুরে এসে একসময়ে এই রাস্তাকেই আড়াআড়ি কেটে বাঁদিকে চলে গেছে কোথায়! সারকুণ্ডা যাওয়ার পথে কিছুটা আগেই ডানদিকের ওই নালার ওপর দিয়ে করা মজবুত কংক্রিটের চওড়া কালভার্ট পেরিয়ে এস. লাল কম্পানির মাইনসের ছোট্ট কলোনিটা। ওদের খাদান আরো ভেতর দিকে। সেখানে লেবার হাটিং (শ্রমিক বস্তি) ইত্যাদি আছে। এখানে একটু পদস্থ চাকুরেদের গুটিকয় আবাস; লজঝরে, সদাব্যস্ত একটি জিপ, দুটি ট্রাক, কয়েকটি ট্র্যাক্টর, কম্প্রেসর, জেনারেটর, শভেল এইসবের একান্ত জরুরি ন্যূনতম সম্ভার নিয়েই চলছে ম্যাঙ্গানিজ আকর তোলার মাইনিং অপারেশন।

আমাদের জিপ নিয়ে ওই কালভার্ট দিয়ে নালা পেরোনোর সময়েই দেখলাম নালা দিয়ে মোটামুটি স্রোতে লালচে জল বয়ে যাচ্ছে। বুঝলাম, আরও জল বেড়ে যাওয়ার আগেই তাড়াতাড়ি পথের ওই নালাগুলি পেরিয়ে যেতে হবে। তাড়াহুড়ো করলেও লাহিড়ির কোয়ার্টারে একটু বসতেই হ'ল চা খেতে। অবশ্য ক্যাম্পে বারদুয়েক চা খেলেও কাজ শেষের পর চাঙ্গা হওয়ার জন্য এই চা-টুকু দরকার ছিল খুবই। তাছাড়া বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যার স্যাঁতস্যাঁতানি! ওদের কাজের ছেলেটিই চা করে দিল।

হালকা সবুজের মধ্যে সাদা সরু লতার ছাপ দেওয়া সিল্কের শাড়িতে সাজা শাশ্বতী মিষ্টি হাসির সঙ্গে অভ্যর্থনা জানিয়ে শেষ মুহূর্তের ফিনিশিং টাচ দিয়ে নিল দ্রুতই। সন্ধ্যের অন্ধকার কাটানো জেনারেটরের কমজোরি আলোয় অসামান্যা লাগছিল একটু শ্যামবর্ণা এই সুন্দরী তন্বীকে। বলেই ফেললাম, "বাঃ, একদম অরণ্যকন্যা যে! অপূর্ব লাগছে তোমায়!" লজ্জা পেয়ে একটু মুচকি হেসে মাথা নামিয়ে নিল – "কী যে বলেন, দাদা! অবশ্য জঙ্গলে থেকে থেকে জংলিই হয়ে যাচ্ছি তো।"
জিপের পেছনে ওর লাগেজ তুলে তাড়াতাড়ি রওনা দিলাম। সামনের সিটে বাঁদিকে বাইরের দিকে আমি, মাঝে শাশ্বতী, একেবারে ডাইনে স্টিয়ারিং-এ বিদ্যাধর, আমাদের কর্মক্ষেত্রে মজা করে বলা হয় 'সুদর্শনচক্রধারী'। বৃষ্টির বেগ ক্রমশ বাড়ছে বুঝতে পারছি। সামনের উইন্ডস্ক্রিনের ওপর দিয়ে একঘেয়ে মৃদু শব্দ করে ওয়াইপার চলছে সমানে। বৃষ্টির ছাট ঠেকাতে জিপের দুপাশের আর পেছনের ক্যানভাসের ফ্ল্যাপ খুলে আটকানো হয়েছে। হেডলাইটের আলো বৃষ্টির ধারাকে কেটে সামনের লাল মোরামের ভেজা রাস্তাকে দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। রাস্তার ওপর দিয়েও জলের সরু-মোটা নানান সোঁতা বয়ে চলেছে ঢালের দিকে। বৃষ্টি, রাস্তা, সারাদিনের কাজ, সাইটের নানান গালগল্প এইসব নিয়েই টুকরোটাকরা কথা চালিয়ে যাচ্ছি বিদ্যাধরের সঙ্গে। শাশ্বতী একটু চুপচাপ। দুয়েকবার কথার মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা করেও সামান্য "হুঁ, হাঁ, কী" ছাড়া তেমন সাড়া পেলাম না। হয়তো স্বামীকে একলা ছেড়ে আসায় মনখারাপ। অথবা, বৃষ্টির রাস্তায় রাতের অন্ধকারে চলার টেনশন! আর, যতই চেনাজানা ও ভরসার মানুষ হোক, পরিবারের বাইরের দুজন লোকের সঙ্গে এই রাতে নির্জন রাস্তা দিয়ে লম্বা পথ পাড়ি দেওয়া – একজন যুবতী মহিলার পক্ষে খুব সহজ তো নয় ব্যাপারটা! অথচ প্রায় নিরুপায় বা নান্যপন্থা হয়েই এই সূচি নিতে হয়েছে। ঘরোয়া আড্ডায় কিন্তু বরাবরই ওকে বেশ সহজ, খোলামেলা আচরণে পেয়েছি।

বৃষ্টি যদিও হয়েই চলেছে, একে একে চারটে নালা জিপের চাকা অর্ধেক ডোবা জল পার করে, বেশ খড়বড় করতে করতে পেরিয়ে এলাম। খুব দুশ্চিন্তা বা টেনশন আমি কোনো অবস্থাতেই করি না। তবু এই ক'টা নালার জলের পরিমাণ দেখে আমার আত্মবিশ্বাস যেন আরেকটু জোরদার হ'ল। খেয়াল করলাম, কিছুক্ষণ ধরে শাশ্বতীও বেশ সহজ হয়ে উঠেছে; আমাদের কথাবার্তায় অংশ নিচ্ছে। নালার জল কেটে জিপ পার হওয়ার সময় কিছুটা টালমাটাল হয়েই যায়, ফলত এ ওর গায়ে পড়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রথম বারদুয়েক ও একটু সংকুচিত হয়ে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করলেও পরে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছে পরিস্থিতিকে। হেসেও উঠছে এই ঝাঁকুনি-দুলুনিতে।

চার নম্বর পেরিয়ে পঞ্চম নালাটা আবার বেশ কিছুটা দূরে। কিন্তু তার কাছাকাছি পৌঁছাতেই আক্কেল গুড়ুম! সর্বনাশ! এ যে ভয়ঙ্কর স্রোত! প্রায় পাড় ছুঁই ছুঁই! সেই যে দু-আড়াই ঘন্টা আগে বিদ্যাধর বলেছিল পাহাড়ে বৃষ্টি হওয়ার কথা, সেই

জল এতক্ষণে এতটা পথ পেরিয়ে 'হড়পা বান' হয়ে বয়ে চলেছে এখান দিয়ে। নিশ্চিন্তমনে পেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে নালার কাছাকাছি এসেই বিদ্যাধর চমকে গিয়ে ব্রেক চেপে দাঁড় করালো জিপ। প্রচণ্ড গর্জন করে গাঢ় গেরুয়া রঙের জলের স্রোত আমাদের সামনের নালা ভরে বাঁদিক থেকে এসে ডানদিক দিয়ে চলে যাচ্ছে। এরকম যে আগে দেখিনি তা নয়, তবু কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম। শাশ্বতীও হঠাৎ আমার ডান হাতটা আঁকড়ে ধরে ওর সমস্ত শরীর চেপে ধরল। এই পরিস্থিতিতেও এক সম্পূর্ণ অন্যরকম স্পর্শে আমার পঁচিশ বছর বয়সী যুবক শরীরের ভেতরে যেন একটা ঝাঁকুনি লাগল। নিজেকে সঙ্গে সঙ্গেই শাসন করে নিলাম যদিও।

গাড়ির হেডলাইটের আলোয় যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাছাড়া চারিদিক নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা। গাড়ির এঞ্জিন ও ওয়াইপারের মৃদু একঘেয়ে আওয়াজ ছাড়া বাইরের বৃষ্টির আর ঝিঁঝিসহ নানারকম পোকামাকড়ের সঙ্গীতলহরী এক অদ্ভুত আবহের সৃষ্টি করছে। বিদ্যাধরকে বললাম, "ইয়ে বাঢ় কা পানি তো কব বন্দ হোগা পতা নেহি। বৃষ্টি হয়েই চলেছে, মানে জলও এইরকম বয়েই চলবে। এখানে এইভাবে থাকা তো সম্ভব নয়। তারচেয়ে ব্যাক করে চল ক্যাম্পে গিয়ে রাতটা কাটিয়ে ভোরবেলায় রওনা দেব।"

বিদ্যাধর একটু হেসে বলল, "সাহাব, পিছে কা সারা নালা অবতক চুপচাপ ব্যয়ঠা হ্যায় ক্যায়া?"

তাও তো বটে! তবু...

শাশ্বতী একইভাবে আমার হাত আঁকড়ে ধরে আছে। ওর নার্ভাসনেস বুঝতে পারছি। সাহস দেওয়ার জন্য বললাম, "ঘাবড়িয়ো না। আমি আছি, আর এই বিদ্যাধর আছে। এরচেয়েও বহু কঠিন সমস্যা সামলে নেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে আমাদের।" ও অবাক করে দিয়ে বলল, "আপনার ওপর আমার কতটা ভরসা তা আপনি জানেন না। আমি নিশ্চিন্তে আছি আপনি পাশে আছেন জেনেই।"

বিদ্যাধর ওই অল্প চওড়া রাস্তাতেই কিছুটা কসরৎ করে গাড়ি ঘুরিয়ে সারকুণ্ডা ক্যাম্পমুখো চলল। এই গাড়ি ঘোরানোতেও নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারলে বিপদ হতে পারত। রাস্তা বাদ দিয়ে দুপাশে আঠালো মাটির সঙ্গে আলগা ল্যাটেরাইট, নিরাপদ জায়গা ছাড়িয়ে একটু বেরিয়ে গেলেই গাড়ির চাকা বসে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। তখন চাকা ঘুরবে না, নয়তো একই জায়গায় বাঁইবাঁই করে ঘুরে যাবে, এগোবে না। তবে বিদ্যাধর তো এক্সপার্টের চূড়ান্ত! কাজেই চিন্তা কী?

কিন্তু হা হতোস্মি! পেছনের চার নম্বর নালাও এতক্ষণে হড়পা বানের জল পেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে যে! কিছুক্ষণ আগেই যে আমাদের নিশ্চিন্তে জল কেটে পেরোতে দিয়েছে, তার রূপও এখন বিদ্রোহী গেরুয়া! কী সর্বনাশ! এ যেন –

"...আমি দুর্ব্বার
আমি ভেঙে করি সব চুরমার
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন,
যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল..."

এত ভয়ানক পরিস্থিতিতেও চট করে 'বিদ্রোহী' কবিতার অংশটুকু মনে পড়ে গেল। নিজের মনেই আউড়ে গেলাম এইটুকু। তারপরেই লজ্জা লাগল, কারণ পাশে তাকিয়ে দেখি মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে শাশ্বতী। বললাম, "এই অবস্থাতেও কবিতা! পাগল ভাবছ, তাই না?"

ও যেন একটা ঘোরের মধ্যে থেকে বলে উঠল, "এইজন্যেই আর এইটাই তো আপনি, যে আমার..." কথাটা অসমাপ্ত রেখেই ও চুপ করে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "যে তোমার...কী? কথাটা শেষ করলে না!"

শাশ্বতী "জানি না" বলে চুপ করে গেল।

আমরা দুই নালার মাঝে মোটামুটি একটা দ্বীপের মধ্যে আটকা পড়েছি। বিদ্যাধর হঠাৎ গাড়ির হেডলাইট নিভিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল, "সাহাব, একদম আওয়াজ মত কীজিয়ে গা। আপ তো পণ্ডিত (ব্রাহ্মণ) হ্যাঁয়! গণেশ ভগওয়ান কা মন্তর য়াদ হ্যায়? পঢ়তে রহিয়ে।"

- "ক্যায়া মতলব? আমি অত ভক্ত-টক্ত নই। ওসব আমার মনে থাকে না। বলিও না। কিন্তু লাইট নেভালে কেন?"

- "সাহাব, আপকে বাঁয়া তরফ জরা গওর সে দেখিয়ে।"

হ্যাঁ, গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে উইন্ডস্ক্রিনের ভেতর দিয়ে জিপের বাঁদিকে খুব নিবিষ্টভাবে কিছুক্ষণ দেখার চেষ্টা করে যা পেলাম, তাতে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়। বেশ কিছুটা দূরে ওই নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে আরও এক জমাট বাঁধা আঁধার যেন। একপাল জংলি হাতি নীরবে ভিজে চলেছে। ওরাও

আমাদের মতোই দুদিকের নালার তাণ্ডবে আটকে পড়েছে। হয়তো শাল বা অন্য গাছের পাতা খেতে এসেছিল। এ যে দেখছি একের পর এক দুর্যোগ!

শাশ্বতী আরও ঘন হয়ে এসে ওর প্রায় পুরো শরীর আমার শরীরের সঙ্গে চেপে ধরেছে। ওর ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। এই পরিস্থিতিতে যে কেউই ভয় পাবে। টের পাচ্ছি শাশ্বতীর ঘন হয়ে ওঠা নিঃশ্বাস আমার শরীরে। একটু অন্যরকম অস্বস্তি সামান্য হলেও অনুভব করছি। আসলে এইরকম শরীরী ঘনিষ্ঠতার অভিজ্ঞতা তো একেবারেই নেই। জন্ম থেকেই প্রায় পরিজন ছাড়া আমার জীবন কেটেছে পাহাড়-জঙ্গলেই। তবু নিজের অনুভূতিকে সরিয়ে রেখে আমি ওর দুহাতের তালুদুটো আমার হাতের মধ্যে নিয়ে খুব নিবিড়ভাবে চাপ দিয়ে ধরে রেখে নীচু স্বরে বললাম, "ভয় পেয়ো না। ওরাও এখন বিপন্ন। কিচ্ছু করবে না।" অনুভব করলাম, ওর হাতদুটো ঠান্ডা হয়ে আছে, একটু যেন কাঁপছে। বেশ অনেকক্ষণ চুপচাপ ওইভাবে ধরে রাখার পর মনে হ'ল ও একটু সহজ হয়েছে। হাতের অল্প কাঁপুনিটা থেমেছে। শরীর আমার সঙ্গে সাঁটিয়ে রাখলেও একটু যেন স্বাভাবিকতা এসেছে।

বিদ্যাধর ওদিকে গণেশ ভগবানকে একমনে ডেকে চলেছে, নানান স্তুতি আর প্রার্থনাসহ – "হে গণেশবাবা, হম সব গরিব লাচার আদমি। বহোত মুসিব্বত মে ফঁসা হুয়া। দূর সে হী খালি আশীর্বাদ দে দেনা ভগওয়ান। নজদিক আনে কা কষ্ট্ না করেঁ বাবা।" আমিও ওর সঙ্গে টুকটাক কথা চালিয়ে যাচ্ছি। পাছে হাতির পালের নজর এদিকে পড়ে, তাই গাড়ির এঞ্জিন ও আলো বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আমাদের কথাবার্তাও প্রায় ফিসফিসের পর্যায়েই চলছে। সময় পার হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে সব যেন থেমে গেছে। বিদ্যাধরকে বলতে ও ব্যাকসিটের দিকে হাত বাড়িয়ে ব্যাগ থেকে ওয়াটার-বটল বার করে দিল। শাশ্বতীকে বললাম, "একটু জল খেয়ে নাও, শরীরে মনে জোর আসবে।" মানসিক চাপ বা বিধ্বস্ততার সময়ে জলটা খুব কাজে দেয়, এটা দেখেছি। আমাদের পেশি ও নার্ভগুলোকে তাজা করে দেয়। ও প্রথমে "না না" করছিল। কিন্তু বুঝিয়ে বলায় রাজি হ'ল। তারপর কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে চোখে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। বুঝতে পারছি, ও পরিস্থিতির সঙ্গে ক্রমশ সহজ হয়ে উঠছে।

বৃষ্টি হয়েই চলেছে, জলও বয়েই চলেছে। আমাদের সামনে-পেছনে বা ডাইনে-বাঁয়ে সর্বত্রই। শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই কোনো। বৃষ্টি থামলেও আরও অন্তত ঘন্টা দু'তিন অপেক্ষা করতে হবে নালার জল নেমে যাওয়ার জন্য। এই জল সেই পাহাড়রাজি থেকে নেমে আসছে, ছোট ছোট অগুনতি স্রোত পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে ছুটতে ছুটতে একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে যাচ্ছে। নাচতে নাচতে তাদের এই দৌড়ে আরও সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে দলে ভারী হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে কোনো বড় আকারের নালা। এভাবেই জলধারা বয়ে বয়ে সমতল জমি ছুঁয়ে হয় ওদিকের বৈতরণী, নয়তো এদিকের ব্রাহ্মণী নদীতে গিয়ে মিশে চলে যাচ্ছে আরও বড় উত্তরণের পথে – সমুদ্র সঙ্কাশে।

এসব সময়ে আমার সময় কাটানোর প্রধান উপায় গুনগুনিয়ে গান গেয়ে যাওয়া। আপাতত সেটাই করে যাচ্ছি – একের পর এক সুর নিজের মতো করে ভেঁজে চলেছি। বৃষ্টিভেজা এই রাতের পরিবেশ, জঙ্গল, আর সব ছাপিয়ে আমাকে জড়িয়ে থাকা শাশ্বতীর নরম শরীর, ওর নিঃশ্বাস, শরীরী সুগন্ধের এক অচেনা মাদকতা – এসব থেকে নিজেকে সচেতনে সরিয়ে রাখার জন্য গানে ডুবে যাওয়া ছাড়া সহজ উপায় কী হতে পারে? সর্বাবস্থায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় সহায় আর কে আছে! বেশ কিছুক্ষণ চলার পর দেখি শাশ্বতীর গলাতেও সুর ডানা মেলতে শুরু করেছে। আমি ব্যাটন হাত বদল করে এবার নিশ্চিন্তে গান শুনে সময় কাটাতে লাগলাম। ওর গানের গলাটা সত্যিই মিষ্টি। বিদ্যাধর আমাদের আরামে বসার সুবিধে করে দিতে অনেকক্ষণ আগেই পেছনে গিয়ে বসেছে। হাতির পালকে আড়াল করে দুয়েকবার গাড়ি থেকে নেমে একটু হাত-পা খেলাতে পায়চারি করেছে। মাঝে মধ্যেই হাতঘড়ি দেখছি। এখন রাত প্রায় এগারোটা। খিদের চেতনা চলেই গিয়েছিল। খুব চট করে তো এখান থেকে বার হতে পারার আশা নেই, বুঝতেই পারছি। আমার ব্যাগটাকে সবাই বলে 'হোয়াট-নট-স্টোর'। বিদ্যাধরকে বলে পেছনে রাখা ওই ব্যাগ থেকে কয়েকটা বিস্কুটের প্যাকেট, কলা আর চকোলেট বার করালাম। বিদ্যাধর অবশ্য বিস্কুট, চকোলেট কিছুই নিল না – "হমারা ইসসে ক্যায়া হোগা সাহাব? মেরা তো অপনা জুগাড় হ্যায় হি।" ইশারাই তো অনেক! একটু পরে বলল, "সাহাব, আপলোগ জরা আরামসে ব্যয়ঠিয়ে, ম্যায়

ব্যাকসিটমে হি থোড়া লেট যাতা হুঁ।" বুঝতে পারলাম, ও আড়ালে গিয়ে আজকের তাজা কালেকশন কিছুটা খাঁটি মহুয়া গলায় ঢেলে নিয়ে এই একঘেয়েমি আর ক্লান্তি দূর করার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। এবার ওর একটু গা এলিয়ে দেওয়া খুব দরকার। শাশ্বতীও পরিস্থিতি বুঝতে পারছে সম্যক। তাই কোনো বাহানা না করে বিস্কুট, কলা, জল খেয়ে নিল আমারই সঙ্গে। ওর মনের মধ্যে কী চলছে আন্দাজ করতে পারছি। কোনোদিকে কোনো খবর দেওয়ার তো উপায় নেই! লাহিড়িসহ সারকুণ্ডার লোকেরা ভাবছে আমরা ভদ্রাশাহী এবং বড়বিল পৌঁছে গেছি। আর ভদ্রাশাহী ও বড়বিলের লোকেরা (লাহিড়ির পিসির বাড়ি) ভাবছে আমরা সারকুণ্ডাতেই আছি। চমৎকার অবস্থা! কোনোই উপায় নেই, অথচ এই পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে কে কতটা বিশ্বাস করবে সেটাও পরে একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে আমার আত্মবিশ্বাস আছে, অন্যদের কাছে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা কতটা সেটাও জানি। কাজেই, শাশ্বতীর কথা জানি না, আমার তেমন দুর্ভাবনা নেই। পরিস্থিতি, যা আমাদের একেবারেই হাতে নেই, তা আমাদের যেভাবে নিয়ে চলছে, আমরা সেভাবেই চলছি।

বৃষ্টির তোড় বেশ কিছুক্ষণ হ'ল অনেকটা কমেছে। তবে নালার জল সরতে এখনো দেরি আছে। ওদিকে হাতির দল একই জায়গায় একইভাবে দাঁড়িয়ে মাঝেমধ্যে জল ঝাড়ার জন্য বা পোকামাকড় তাড়ানোর জন্য বিশাল বিশাল কান ঝাপটে যাচ্ছে। বিদ্যাধরের গভীর ভারী নিঃশ্বাসের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। শাশ্বতীকে বলতে ও পাদুটো সিটের ওপর তুলে আধা ভাঁজ করে রাখল। ফলে আর একটু কাৎ হয়ে শরীরের ভার আরও কিছুটা আমার ওপর ছেড়ে দিল । আমি নানান কিছু নিয়ে টুকটাক কথা বলে যাচ্ছি, আমার ছোটবেলার সেই ভিলাই, কিরিবুরু, নরাজ, সাঁওতাল পরগনার বারহারোয়া, তিনপাহাড়, কাশ্মীর এইসব জায়গার নানা স্মৃতি আর গল্প। ও প্রথম প্রথম কিছু কথা বলছিল। লক্ষ্য করলাম, ধীরে ধীরে ওর কথা কমে আসছে। কিছুক্ষণ পরে খেয়াল করলাম, ও পাদুটো একটু গুটিয়ে এনে খানিকটা আসন করে বসে আমার পিঠের দিক দিয়ে ওর বাঁহাত আর সামনের দিক দিয়ে ডানহাত নিয়ে আমার ডান কাঁধের ওপর ওর দুহাতের আঙুলগুলো ক্ল্যাম্প করে আঁকড়ে ধরল, আর তারই ওপর থুতনিটা রেখে আমার কথা নিবিষ্টভাবে শুনে যেতে লাগল। একটা যেন সরল আদুরে শিশুর মতো ওর সামগ্রিক ভঙ্গিটা। খুব ভাল লাগল ওর এই বিশ্বাস রাখার ভঙ্গিমা। বেশ কিছু সময় এইভাবে পার হবার পর বিদ্যাধরের মতো শাশ্বতীরও কথা পুরোই বন্ধ হয়ে নিঃশ্বাস ক্রমশ দীর্ঘ আর ভারী হয়ে চলতে লাগল। ওর কমনীয় শরীর আরও বেশি করে আমার গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। মাথাটা আমার ডান কাঁধের ওপর পেতে রাখা। পুরো শরীর দিয়ে অনুভব করতে পারছি ওর নিঃশ্বাসের ওঠাপড়া। সচেতনভাবে নিজের ভাবনায় এই অভূতপূর্ব অনুভূতিকে জাঁকিয়ে বসতে না দিয়ে মনকে অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। একা থাকলে আমি যা করি, মনে মনেই পুরনো নানান কথা, নানাজনের সঙ্গে হয়ে যাওয়া বাক্যালাপ, কিংবা পুরনো বন্ধুদের কারও সঙ্গে দেখা হলে কী কথাবার্তা হতে পারে – এইসব কল্পনায় ফ্ল্যাশব্যাকে দেখতে থাকা বা আউড়ে যাওয়া – তাইই করে যাচ্ছি। বাস্তবেই দেখেছি, এতে কোথা দিয়ে যে বেশ সময় কেটে যায় টেরই পাওয়া যায় না।

নিজের মধ্যেই হয়তো ডুবে গিয়েছিলাম বুঁদ হয়ে, আচমকা একটা অন্যরকম এবং অভাবনীয় স্পর্শে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার সারা শরীরে – আমার গালের ওপর শাশ্বতী ওর নরম ঠোঁটদুটি একটুক্ষণ চেপে রেখে মুখটা আবার আমার কাঁধের ওপর থুতনিতে ভর দিয়ে রাখল ওর আবিষ্ট দুচোখ আমার মুখের দিকে মেলে। চমকে গেলাম একেবারে। আমার কাঁধের ওপর ওর মুখ। আমি আস্তে করে মুখটা ঘোরাতেই ওর ঠোঁট আবার ছুঁইছুঁই জায়গায়। ও তারমধ্যেই ফিসফিস করে বলে উঠল, "আর পারলাম না নিজেকে ধরে রাখতে, জানো! অনেকক্ষণ ধরে তোমায় দেখে যাচ্ছি। মনে হচ্ছিল চোখ মেলেও যেন ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছ।" এই প্রথম শাশ্বতী আমায় 'তুমি' করে বলল! আমি কোনো কথা না বলে শুধু আলতো করে ওর চুলের ওপর দিয়ে আঙুল চালিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। ও একইভাবে আমার মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে কিছুক্ষণ পর বলল, "তুমি কী ভাবছ জানি না, তবে এটুকু বলি, আমি কিন্তু ওকে সত্যিই খুব ভালবাসি। আর সেটা নিখাদ। কিন্তু তাই বলে আর কাউকে ভালবাসতে পারব না – সেটাও আমি মানি না। তোমাকে অনেকদিন ধরে কাছ থেকে দেখে মনের মধ্যে একটা আসন দিয়েই রেখেছি, যেটা কেউ জানে না। আর সেটাকে

কোনো অপরাধ বলেও মনে করিনি কখনো। কিন্তু, আজকের মতো এতটা কাছ থেকে, এতটা দায়িত্বশীলতার মধ্যে, আবার এইরকম ধ্যানমগ্নতার মধ্যে তোমাকে দেখতে পেয়ে কেমন যেন মোহের মধ্যে চলে গেলাম। মনে মনে আমার অন্তরকে নিবেদন করলাম তোমার পায়ে। একথা অন্য কাউকে বোঝানোর নয়, বলার নয়। এমনকি তোমাকেও নয়। তবু বলে ফেললাম শুধু তোমাকেই, তুমি বুঝবে বলে।" ও আবার আমার কাঁধের ওপর মাথাটা পেতে চোখ বুজে রইল। আর আমার মনের মধ্যে এই আকস্মিকতার ধাক্কায় চলছে এক ঝড়। সচেতন বিষয়ী মন বলল বাস্তবে ফিরতে হবে।

বিদ্যাধর বেশ ঘুমিয়ে যাচ্ছে এখনো, মহুয়ার কল্যাণে। অন্ধকার থাকলেও চোখ সয়ে এসেছে। ঠাহর করলাম নালার জলের লেভেল নেমে এসেছে অনেকটা। ঘড়িতে দেখছি রাত তিনটে কুড়ি। আলো এখনো না ফুটলেও একটু ফর্সা হতে শুরু করবে আর কিছুটা পর থেকেই। তখন হাতির দলেরও নড়াচড়া শুরু হয়ে যেতে পারে। গাড়িসহ এই কয়েকটি প্রাণীর ওদের হাতের কাছে উপস্থিতি ওরা পছন্দ না-ই করতে পারে। আর অপছন্দের ক্ষেত্রে ওরা যে কী করতে পারে তার নিদর্শন বহু পেয়েছি।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শাশ্বতীর মাথাটা আলতো করে ধরে সোজা করে দিয়ে বিদ্যাধরকে ডেকে তুললাম। শাশ্বতীও পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসল। হাতির পালের সজাগ হয়ে ওঠার আশঙ্কার কথা বললাম বিদ্যাধরকে। আমাদের ড্রাইভাররা সবাই চট করে পরিস্থিতি বুঝে নেওয়ায় দারুণ দক্ষ। ও অন্ধকারেই নেমে সন্তর্পণে নালার কাছ অবধি গিয়ে দেখে এসে জানাল, এখন রওনা দেওয়া যাবে। জল অনেক কমেছে। তবে জলের স্রোতে প্রচুর কাদাও এসেছে নালায়, ফলে পার হওয়া খুব সহজ হয়তো হবে না। তবু দেখা যাক। সমস্যা হ'ল গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার। এঞ্জিন চালু করলেই আওয়াজে হাতির পাল আকৃষ্ট হবে। ঠান্ডা হয়ে আছে, শুরুতে একটু 'রেজ' দিতেই হবে, তার আওয়াজও বেশ জোরে হবে। তার ওপর গাড়ি আছে সারকুণ্ডার দিকে মুখ করে। আমাদের তো যেতে হবে উল্টোদিকে, ভদ্রাশাহীর দিকে! বিদ্যাধরকে বললাম, "গাড়ি নিউট্রালে ফেলে চলো দুজনে মিলে ব্যাকে ঠেলে নিয়ে যাই ওদিকের নালা পর্যন্ত। হাতির দল তো এখানে। ওপাশের নালাটা তো দূরে আছে। ওদিকটায় গিয়ে স্টার্ট করলে ওরা পৌঁছানোর আগেই আমরা গাড়ি ঘুরিয়ে পালিয়ে যেতে পারব।" রাস্তা প্রায় সোজাই, বিদ্যাধর ঠেলতে ঠেলতেই দরকারে স্টিয়ারিং ধরে ঠিক করে নিতে পারবে। শাশ্বতী চাইলেও ওকে নামতে দিলাম না।

পরের কাজটুকু পরিকল্পনা মাফিকই হ'ল। অনেকটা পথ – জিপটাকে প্রায় কুড়ি মিনিট ঠেলতে ঠেলতে পাঁচ নম্বর নালার পাড়ে পৌঁছানো গেল। চারটে প্রায় বাজে। আলোর আভাস দেখা যেতে শুরু করবে এখনই। ঝটপট দুজনে জিপে উঠতেই বিদ্যাধর স্টার্ট দিল। পেট্রোলের এঞ্জিন, আর প্রায় নতুন গাড়ি, তাই সময় নিল না। দ্রুত গাড়ি ঘুরিয়েই প্রথমে সেকেন্ড গিয়ারে দিয়ে স্পিডে কাদার জায়গাটা পার করেই ফোর বাই ফোর-এ লাগিয়ে উঁচু পাড়ে উঠে পড়ল। ঝাঁকুনিতে টালমাটাল শাশ্বতী আর আমি এ ওর গায়ে কয়েকবার পড়লাম। এতক্ষণের মানসিক চাপ কাটিয়ে হাসির ছররা চলল খানিক।

আরও দুই নালার হাঁটুজল পেরিয়ে, গুয়ালি হয়ে মেইন রোডে উঠে ডানদিকে ঘুরে গাড়ি ছুটল পুবমুখো – ভোরের আলোর দিকে। শাশ্বতী আলতো করে আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরে বসে রইল।

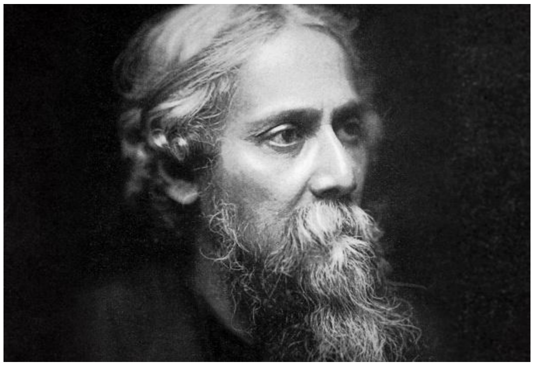

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

মণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার দৃষ্টিতে তুমি
সীমাহীন ব্যথার মন্দির,
হয়েছ দুঃসহ চাপে হীরকের মতো –
কঠিন, ভাস্বর।
বহনি অশ্রুতে গলে
দহনি ভূষণ –
রচে গেছো ভালবাসা, প্রগাঢ় প্রণতি
ধ্যানের বেদীর পরে!

পৃথিবীর উদাসীন হাওয়া
কালের দিগন্ত থেকে বহে চলে অনন্তের দিকে,
রাখে না হিসাব –
কত জীর্ণ ছিন্ন শাখা ঝরে পড়ে তলে।
স্পর্ধিত বাতাস
বাধা পেয়ে স্তব্ধ হয় তোমার মর্মরে,
মর্মরিয়ে ওঠে
দেখে তোমার কেতন –
নম্র, সুউন্নত
রাতের শিশির-জমা তুষারকিরীটে!

শেষ কথা

দেবাশিস মজুমদার

আমি বললাম কীরে
আর আসিস না কেন?
কবিতা মাথা নীচু করে লাজুক শুধু হাসে।

আমি বললাম, আমি বুড়ো তাই?
ও বলল, ধ্যাৎ,
তাহলে কি এই অন্ধকার
স্যাঁতসেঁতে ঘরে ফিরে
আসতে ইচ্ছে করে না আর?

আমি দেখি চেয়ে চেয়ে
অমল কিশোরী মেয়ে,
যাকে দিয়েছিলাম স্বপ্নের রাস্তাঘাট, নদী
যদি
আর কখনও না দেখি?
ভাবতেও পারি না, সে কী!

কবিতা ওর কাজলকালো চোখদুটো তুলে
বলল, আসি?
আমি হাত বাড়িয়ে ওর মুখখানি ছুঁই।
আর আসবি না তুই, জানি।

এবার সন্ধ্যে নামবে চোরের মতো
আমার খিড়কি দোরে
দু'একটা তারা ফুটে উঠবে রাশি রাশি
অন্ধকারে। হাস্নুহানা আনবে মায়াবী তার গন্ধ।

ও ফিরে যাবে
যেমন নিস্তব্ধে এসেছিল তেমনিভাবে।

আমিও হারাব আমার কুলুপ বন্ধ
একলা ঘরে।
ভালবাসায় জল উথলে পড়ে
দু'চোখে।
ঝাপসা আলোয় আবার দেখি ওকে।

আমৃত্যু

উদ্দালক ভরদ্বাজ

বসন্তের মরসুমে বিষণ্ণ প্রহর
উপহার দিত যে, তাকে আজ খুব বেশী করে মনে পড়ে।
জীবনের প্রত্যহকে নীলজল আচমনে ভিজিয়ে
দুঃখের নদীর থেকে উঠে
আমার আর্ত চোখে শান্তিজল ছিটিয়ে
চলে যেত সে, ভঙ্গির গ্রীবার পাশে
তার সেই হাসি আজ বড় দুর্লভ মনে হয়।
দুর্লভই তো...

"দুর্বিষহ বলে কিছু নেই,
তুই কতটা নিতে পারিস তুই নিজেই জানিস না"
বার বার বলত আমায়...
আমি বলতাম "ভেঙ্গে যাব, আমি পারব না
তোর মতো দুঃখ সইতে"।
দু'চোখে নিবিড় হয়ে, কবিতার মতো
আমার হাতদুটো তুলে নিত
"আমার মাথায় একটু হাতটা রাখ না পৃথু!"

স্মরণের অবিস্মরণীয় আকাশে আজ বড় মেঘ রুনি
তোর রাগ, অভিমান, কোনদিন সেভাবে দেখিনি
অথচ আজ ভাবি, তোরই গানে অমৃত ছিল
তোরই চোখে সমস্ত বাসনা।
তোরই হাতে সঁপার ছিল ছিন্ন জীবন।

আমাকে আকাশ দিতে চাইলি রুনি,
আকাশ করে দিতে পারলি না?
তোর মতো, দুঃখের আকাশে, নীল,
ঘুরে ঘুরে আমিও উড়তাম না হয়!

"ভালবাসা পিদিমের মতো"
"ভালবাসা আঙ্গিনার মতো"
"ভালবাসা যন্ত্রণার মুখ চেয়ে সবচেয়ে কঠিন ব্রত"
কিছুই বুঝিনি তখন
অথচ দেখ, এখন শূন্য সোপানে ঘুরে ঘুরে
সারাদিন স্বপ্ন দেখি, তুই নেমে আসছিস...

আমার বুকের গভীরে,
আমার ক্লান্ত নীল চোখের অতলে,
ফিরে আসা পায়ের নূপুর তোর
বেজে বেজে, নিভে নিভে
বেজে ওঠে আবার, আবার···
রাত্রি'ভর...

কবিতা

উদ্দালক ভরদ্বাজ

কবিতা একটা চঞ্চল মায়া, ডেকে চলে যেত।
কবিতা একটা নষ্ট ভণিতা, ভাবতে পারি না।

যেদিনের গান সেদিনই থামল, তবে এতদিন –
কোন সুরে বেজে, কেন থেমে যায়?
কার চোখে গিয়ে ভুল কথা বলে,
শুনে চলে গেল; পরপার নদী
কেন আজ শুধু হাহাকারে গায়?

কেন গান আর গোলাপের গতি
তোমার আমার বিনা সম্মতি
ছিঁড়ে খুঁড়ে, ঝরে, রক্ত অঝোরে –
মাটি হয়ে মেশে কাদার আদলে?

কেন, কার ভুলে, স্বপ্ন কাননে
থেমে গেল বাঁশি কেউ কি জানে না?
কবিতার ভুলে, মাশুল গুনল
মানুষের মন; ছাই পড়ে শুধু।

শুধু পোড়া ছাই, তবু আধো স্বর
বুক ছুঁয়ে ডাকে, তাকে বুকে চাই।
শব্দ! এসো না, গান তুমি যাও!
পোড়া কাঠই থাক। সুরপোড়া ছাই।

অসুখের মন, সুখে নেই গতি
ছেড়ে যেতে চাই; দেবে সম্মতি?

তোমার অভাবে

রজতকান্তি সিংহচৌধুরী

তোমার অভাবে কত নদী গেছে মরে
লুপ্ত হয়েছে কত না বনস্পতি
হৃদয়-হারানো যাত্রী পায়রা খোঁজে
যদি ফিরে আসো কী এমন হতো ক্ষতি?

এখানে এখনও শিউলির বাতি জ্বলে
তোমার ওদেশে টিউলিপ জ্বালে আলো
ম্লায়মান দিন তুমি চলে গেছ বলে
সন্ধ্যা তোমার ওখানে কি জমকালো?

প্রেম চলে গেছে এই গ্রহ থেকে দূরে
মঙ্গলগ্রহে ধ্বক ধ্বক উত্তাপ
আমরা অবুঝ তাই তো হৃদয় খুঁড়ে
খোদাই করেছি একটি মুখের ছাপ।

কথা

অযান্ত্রিক

ফেরার তো কথা ছিল না,
কথা ছিল চলতে থাকার।
আমি কথা রাখায় বিশ্বাসী,
তোমার কথা ছিল ভাঙার।

প্রতিটা জন্মের থাকে দায়,
কিছু রেখে যেতে হবে স্মৃতি।
আমার যতদূর নজর যায়,
চোখে পড়ে উলঙ্গ উদ্ধৃতি।

নগ্নতার অবৈধতা চেয়ে মরি,
উঁকি দিয়ে গভীর নিচু খাঁজে।
নেমে দেখেছি বোবা ভূমিকায়
নীরবতার অনেক গল্প আছে।

তবু মরছি আমরা বকবকিয়ে,
টগবগিয়ে কথার ছুট।
ভাবনা পর্দা স্বচ্ছ সরল,
গোলমালেতে বেবাক চুপ।

রাখছি যে পা নিজের ভেবে,
আদৌ শহর আমার নয়।
তোমার বুকে ঘন্টাধ্বনি,
আরতির বুঝি সময় হয়।

ভুলব বলে রাখছি মনে,
মনের পাড়ায় রিক্সাচালক।
বিরহের নাম আন্তিগোনে,
তাকেও মুক্তি দেওয়া হোক…

বাঙালি জীবন

শেলী শাহাবুদ্দিন

বিছার কামড় খেয়ে শৈশবে, বুকে নিয়ে বিষের বিষাদ,
সাপের ছোবল দেখে যৌবনে, দেখি নিত্য ধর্মবিবাদ।
জামাযত, হেফালাম, কত নতুন প্রজাতি,
সরীসৃপ ভয়ানক, বাড়ে দ্রুতগতি।

নম্র কিশোরী মতো, এ নতুন দেশ,
ছোবলে, ছোবলে নীল, এ কেমন বেশ?
ফিনিক্স পাখির দেহ, নবীন শরীর,
ছোবলে ছোবলে করে দীর্ণ অচির।

এরই নাম বাঙালি জীবন,
অধর্মের পিশাচ তারে পাঠায় সমন।

বাঙালির প্রাণমন মাটির মতন।
জল ঢালো, কী নরম অরূপ রতন!
মেরে তারে করো শেষ, ছুঁড়ে ফেলো দূরে,
বেড়াল জীবন তার, আসে ফিরে ঘুরে।

আজীবন আক্রান্ত বাঙালি বেড়াল,
বেঁচে থাকে কোনোক্রমে ভয়ের আড়াল।
কোণঠাসা বাঙালি ভীরু, ত্রস্ত অনড়,
হঠাৎ সে বাঘ, সে বসায় কামড়!

পড়ে পড়ে মার খাওয়া বাঙালি বেড়াল,
কোণঠাসা বাঘ, তারই অন্তিম চাল।

বেড়াল ও হায়েনা

শেলী শাহাবুদ্দিন

বেড়াল বাঙালি গায় মিঁউ মিঁউ স্বরে,
হায়েনারা শান দেয় দাঁতে ও নখরে।

বেড়ালেরা গান গায়, ‘মাকে ভালবাসি’,
হায়েনার নজরে দেশ, ‘রক্ষিতা দাসী’।

হায়েনার গানে সদা লোভাতুর মন,
বেহেশতের লোভে তারা করে ধর্ষণ।

হায়েনার গানে চাই ক্রোধ আর ভয়,
বাঙালি জাতির গান স্নেহে মায়াময়।

মাটির গন্ধেভরা বাঙালির গান,
হায়েনার অস্তিত্ব ভেঙে করে খান খান।

হায়েনারা শান দেয় দাঁতে ও নখরে,
বাঙালির কণ্ঠরোধ করে ঘরে ঘরে।

আচমকা অদৃশ্যলোকে শুনি গর্জন,
“আমার সোনার বাংলা” কাঁপে ভূমি, বন।

আচমকা ঝাঁপ দেয় বাঙালি বেড়াল,
আবার সে বাঘ! তার পেছনে দেয়াল।

জল বাঙালি

শেলী শাহাবুদ্দিন

ধর্ম দিয়ে দেশ ভেঙেছ, ধর্ম তোমার ছল,
ভালবাসা ধর্ম মোদের, জলাজমির ফল।

যতই তোমরা মারো-কাটো, যতই দাও বলি,
দেহ মোদের জলের মতো, জলের মতোই চলি।

ধর্ম দিয়ে জল কেটেছ, ভাগ করেছ জল,
জল বাঙালি, জলের স্বভাব, হয়নি কোনও ফল।

দ্বিখণ্ডিত দেহ আর দ্বিখণ্ডিত মাথা,
বাঙাল আর ঘটি তবু জলের মতো গাঁথা।

মনসঙ্গীত ১

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

শান্তি, সুখের দিশা কোথায়,
মিলবে খুশী কোনখানে?
তাকিয়ে দেখি বুকের ভিতর,
লুকিয়ে তারা এই প্রাণে।

অশান্তিতে দুষছি সবে,
মনের মতন কেন না হবে?
ইচ্ছে ছেড়ে নে আপনি,
মিলবে সুধা সবখানে।
'মন্দ-ভাল' সবার মাঝে,
শান্তি পাবি সব প্রাণে।

সুখী যদি না হই নিজে,
করবে সুখী অন্য কেউ?
হায়রে অবোধ নে না জেনে,
নিজের মনেই সুখের ঢেউ।

আপন করে শত্রু মিত্র,
নিঃস্ব হলে নালিশ-পাত্র,
ভরবে পরাণ সুখ মহারাজ,
শান্তি বারির প্রেম দানে।
'মন্দ-ভাল' সবার মাঝে,
মিলবে সুধা সব প্রাণে।

মনসঙ্গীত ২

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

জানি তুমি তারে রাখো আশ্রয়ে,
নজরে রয়েছে তোমার সে,
আমি ছেড়ে দিই সকল চিন্তা,
গড়বে তারে যে তুমিই হে!

চোখের আড়ালে কোথা থাকে সে,
কিবা করে সেথা দিনরাত,
কেমনে নিজেরে গড়িছে যে সে!
নির্জনে করি আঁখিপাত।
ভরসা শুধুই তোমাতে হে নাথ,
করবে কীই বা জীবনে সে –
আমি ছেড়ে দিই সকল চিন্তা,
গড়বে তারে যে তুমিই হে!

অজানা ভয়েরে নাহি দিই ঠাঁই, মনে বলি 'থাক নির্ভয়',
দিয়েছে যেজন, গড়বে সেজন, সবার উপরে তাঁরই জয়!

জানি একদিন দাঁড়াবে সে ঘুরে,
পৌঁছোবে ঠিক লক্ষ্যে,
সফল হবে সে দিয়েছ যে ভার,
তুমি রবে তারই পক্ষে!
মুক্ত মনেরে আজ বলি তাই,
মাথা নত করি চরণেতে –
আমি ছেড়ে দিই সকল চিন্তা,
গড়বে তারে যে তুমিই হে!

গলি

শঙ্কর তালুকদার

ব্যানার্জী পাড়া, নামেই কলকাতা
থাকি দোতালার ঘরে
এখানে চটা, ওখানে চটা
কখনও কখনও ঝরে।
আছে কিছু প্রতিবেশী
আরশোলা আর টিকটিকি।
টিকটিকিটা আমার মতো
কখনও ভুখা,কখনও জোটে,
আরশোলা নিজের মতো
যত্রতত্র ঘোরে।

বেতনের কথা থাক
নামেই কাপড়ের দোকানে কাজ।
সন্ধ্যে হলে পার্কে খরচা বাঁচাতে
রাতের খাওয়া বদ্যিবাড়ি
তাদের মেয়ে পড়িয়ে।
সংসারে আগে-পিছে নেই,
কলকাতা শহরের মায়া
শুনি কারও কারও মুখে
যেন গঙ্গায় ঢেউ লাগে।

আমার মতো দুর্ভাগারও
এই দেশে খবর হয়।
কালিন্দী গ্রামের পিসি
খবর পেল কার কাছে,
তার মেয়ের সাথে
শুভলগ্নে হবে পরিণয়।
লগন হ'ল না দেখা
চুপিসারে এলাম পালিয়ে
মেয়েটা বাঁচল
দুঃখের অভিশাপ হতে।

সংকট তবু পিছে পিছে
লালপেড়ে শাড়িতে ডাগর চোখ
হেসে হেসে বলে
এত ভয় পেলে আমাকে।
না হয় বদ্যিবাড়ির বদলে
আমার হাতে রান্না খেতে।
গলির কোণে কোণে
জমে ওঠা জঞ্জালে
মাছির ভোঁ ভোঁ শব্দে
স্বপ্ন যায় টুটে।

পরিচয়

শঙ্কর তালুকদার

পরিচয় প্রতিদিন প্রতিক্ষণ
ঝরাপাতার মতো
মোবাইলে ক্রমাগত ঝরছে
দেশ বিদেশে কত নামে
লাটাই সুতো খুলছে।
নিজের পাড়ায় কেউ চেনে না
নেই তাতে উদ্বেগ
অলীক সাধনে বেশ আছি
মূল থেকে হয়ে উচ্ছেদ।
সমাজের কাছে নই ঋণী
পাড়ায় খুঁজে কেন চিনি
ত্যাগের জীবন যাদের।
পরিচয় মোর যায় ছড়িয়ে
সমাজ সেবার পথটি চিনে

এই ভুবনে কাজ যত করি
নাম আগে যায় ছড়িয়ে।
আড়ালে কিছু কানাকানি
কার কাছে যাই
সে কি মানহানি
বিস্ময় জাগে মনে।
যুগের নিয়মে ধরেছি ধ্বজা
তোমায় আমায় পায় না
ঝরাপাতার শোক,
ডাক এসে যায়
ঝটিকার বেগে
মোবাইলের শুভ কণ্ঠে।

স্বপ্নময় দৃষ্টি

বৈশাখী চক্কোত্তি

তোমার দৃষ্টিতে আমি মরি বারবার
তাকাও কেন ওভাবে আমার দিকে আবার?
গলতে থাকি আমি ওই স্বপ্নিল চোখে চোখ রেখে
ভীষণ আবেগ মাখানো ওই উদ্দাম দু'চোখে।

যত চাই ভুলতে কিছুতেই পারি না,
কী জাদু আছে তোমার ওষ্ঠে বুঝি না।
তোমার শুভ্র হাসিতে এক অনাঘ্রাত কলি
আবেশে জর্জর হয়, কীভাবে যে বলি।

হৃদয়ে হৃদয় বিছিয়ে তোমার স্পর্শ আমি চাই
কৃত্রিমতার বন্ধন সব উন্মুক্ত করি তাই।
এক স্বপ্নের ঘোরে কাটিয়ে দিই আবেশের সেই রাত
সেই রাতের অস্তিত্ব আজও করে আমায় উন্মাদ।

হাস্নুহানার গন্ধ আনে পাগল করা নেশা
সেই নেশাতে খুঁজে বেড়াই সঠিক পথের দিশা।
অবশেষে মিলল যখন নদী তার মোহনায়
উদ্দাম সেই জোয়ারের মাঝে কূল পাওয়া না যায়।

মোম গলানো নীল জ্যোৎস্নায় জোনাকির ঝিকিমিকি
আবেশে, আবেগে আর অনুরাগে রাত্রি মাখামাখি।
সেই দীর্ঘ রাতে আমরা ঘুমকে দিয়েছিলাম ছুটি,
অধিবাসের বাসরে তখন তারাদের হাসি লুটোপুটি।

আজও সেই স্বপ্নবাজের দৃষ্টিতে হারাই বার বার
ডুবে যেতে নেইকো মানা ওই দুর্নিবার দৃষ্টির দরবার।

এক মুঠো প্রেম দাও

সুব্রত ভট্টাচার্য

আমি ঋতুরাজ বসন্তকে বলেছিলাম
আমায় এক মুঠো প্রেম দাও
এত কৃপণতা কেন?
প্রেম আনছ না কেন?
মাথার ওপর নীল আকাশ কিছুটা ঢেকে রক্তিম পলাশগুলো
আমায় মাথায় বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে
ঝরা ফুলগুলো কতগুলি
প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিল
কার মধ্যে আগুন আছে?
কে জ্বালাবে?
কে আঁকবে রামধনু রঙ?
এতগুলো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে
লাল নীল হলুদ সবুজ সব রঙগুলো
গুলে খেয়ে ফেললাম
কোনটা সত্য, কোনটা সঠিক, বিশ্লেষণ হাতড়াতে হাতড়াতে
হুশ করে উড়ে যায়
সুর, ছন্দ, পড়ন্ত বিকেলের আলো।
ঝিলের ধারে পলাশ ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলাম
ঈষৎ শীতের রোদ কোথায়?
বিশ্বাস কোথায়?
মন কামনা সুখ কোথায়?
গুপ্ত প্রেম কোথায়?
ভালবাসার তীব্র আকাঙ্ক্ষা
সেটা কোথায়?
সব কিন্তু বহু দূরে...
সব একে একে কবে বিদায় হয়ে গেছে।
তবুও পলাশের দিকে তাকিয়ে বসন্তকে আরেকবার
মন খারাপের জিওগ্রাফির মতো বিষণ্নতা পাশে ফেলে শেষ
অনুরোধ করেছিলাম,
কিছু না দাও দু'এক কলি সুর তো দাও
বসন্ত হেসে বলেছিল সবই তো দিয়েছি...

দেখার চোখ নেই, নেবার কেহ নেই,
অনুভব নেই, বাউলিয়া নেই,
রাঙ্গামাটির ধুলোপথ ধরে
বাউলিয়ার একতারা, দোতারার
শিমুল পলাশের সুরে
হারিয়ে যাওয়া কোপাইয়ের ধারে
শোনার কেহ নেই।
সব চিন্তার মুখচ্ছবির মধ্যে
এক পশলা, দু পশলা ঝাপসা অন্ধকার শুধু নেই, নেই
যন্ত্রণাভর্তি অস্পষ্টতার শ্বাস।

আমি তো বৃত্ত আঁকিনি

সুব্রত ভট্টাচার্য

আমি জ্যামিতিক কম্পাসে বৃত্ত আঁকিনি
এঁকেছিলাম স্কেলে দীর্ঘ পথ
আর খেয়ালি মনে
ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ গ্রাফটাকে ওঠানামা করেছিলাম।
ভেবেছিলাম চলার পথ হোক দীর্ঘায়িত
শৈশব থেকে দৌড় দিয়ে অবকাশ চেয়েছিলাম
মোটা ফ্রেমের চশমা
বইমেলার নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে হাতে নিয়ে
খুঁজেছিলাম মিষ্টি প্রেমের গল্প আর কবিতাগুলো।
রাত্রিকে ডাকতাম চোখ বন্ধ করে
অনন্তকাল ধরে বয়ে যাওয়া মার্গসঙ্গীত...
জ্যামিতিক কম্পাস অবিরাম ঘুরে চলে
অর্ধবৃত্ত ভরাট করে
কাঁটার বিন্দুটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে,
শূন্য পৃথিবীটা মুছে যেতে থাকে।
এক সময় পেন্সিলের শীষ শেষ হয়ে স্মৃতিটুকু রেখে যায় ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের মতো
রেখে যায় অপূর্ব অনুকরণীয় সৃষ্টি, যা যথেষ্ট এই পৃথিবীতে
অবশিষ্ট আর কিছু না রেখে...

যাহা দিন তাহা তার রাত্রি

ডাঃ নিবেদিতা গাঙ্গুলী

জীবনের একটাই পরিচয়...
সে যে এক পদাতিক যাত্রী,
সূর্যটা ওঠানামা করে না
ঢাকে তাকে অযাচিত রাত্রি।
সামনেতে পড়ে এক রাস্তা,
কোথা যেন এঁকেবেঁকে চলে যায়।
একমুঠো তারকার ভরসা
সেও বুঝি শেষে এসে খসে যায়...
ধুলোমাখা মাটিটায় কান্না
বিশ্বাসে বৃষ্টিকে বুকে নেয়,
স্তম্ভিত প্রশস্ত রাজপথ
সেই জলে ভিজে ভিজে প্রাণ পায়।
কান পেতে শুনেছ সে শব্দ?
হাজারে হাজারে কারা চলছে?
কাঁধে পেলে গল্পের বোঝাটা
জীবনের কথা তারা বলছে?
জীবনের একটাই পরিচয়...
সেই এক পদাতিক যাত্রী
শ্রমিকের বিশ্রাম গল্পেই
যাহা দিন তাহা তার রাত্রি।

ধরণীর হালচাল

রঙ্গনাথ

হয়তো এটা এক উদ্ভট প্রশ্ন –
ধরণীর শুরু ছিল, এ কি দেখবে কোনরূপ অন্তিম?
এ ধরণী কত সুন্দর! কত সমৃদ্ধ! তবু হয় এ ভাবনা।
সে কি মানুষের ভারে জর্জরিত; গুরুতর বিপদগ্রস্ত
সে কি আঘাতপ্রাপ্ত? তার উপর হচ্ছে কি যাতনা?

বহু কিছু দেখে ভয় পাই –
যুদ্ধে ধ্বংস হচ্ছে দেশ-মহাদেশ; বিশ্বব্যাপী মহামারী!
দেখি অগ্নিকাণ্ড, বিধ্বংস অরণ্য; বন্যা, পরিবেশ-দূষণ
উষ্ণায়ন, অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প আর ভূমিধ্বস;
হিংসা-ঘৃণার ছড়াছড়ি হানাহানি-গণহত্যা-উৎপাটন!

এ ধরণী কি রক্ষা পাবে?
দেশে-দেশে, মানুষে-মানুষে যদি থাকে সমঝোতা;
যদি সবার দেশ-ধর্ম-বর্ণ-রঙ হয় স্বীকৃত, পায় সম্মান;
যদি মানবতা বাঁচাতে শান্তির বাণী হয় সর্বগৃহীত –
সব দুর্ভাবনা ঘুচে যাবে, বিশ্বের সবার হবে কল্যাণ।

মানুষের করনীয় কী?
সত্য বটে, এ ধরণী ও মানুষের ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা –
যদি মানুষ চিন্তা-কর্ম দ্রুত বদলায়, আনে সংশোধন
ধরণী পাবে নবজীবন; ক্রমে ক্রমে সব স্বাভাবিক হবে।
আসবে সম্প্রীতি, স্থির-শান্ত পরিবেশ; রবে না দূষণ।

ধ্বংসকান্ড: পোড়ন-ভাঙ্গন-নিধন

রঙ্গনাথ

নিশ্চয় জানো, যা কিছু ভাঙো, সবকিছুই দেশের সম্পদ;
এসব জনগণের কর দ্বারা তৈরী বা বিদেশী ঋণে গড়া।
এখন নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে করছ কার ক্ষতি?
ছাত্র-অছাত্ররা, সবার দরকার একটু ভাবনা-চিন্তা করা!

কোন ক্ষমতায় শত শত বাড়ি ভাঙছ দিনকে দিন?
কেন সবকিছু লুট করে, আগুনে পুড়ে করছ চুরমার?
কেন বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, আইন-শৃঙ্খলা উধাও?
দেখছি এখন অন্ধ-বধির প্রশাসন, ফৌজ ও সরকার!

কেন এত ক্ষোভ? শত্রু নিধন ও ভাঙার শেষ কোথায়?
যখন লাঠিপেটা, খুনাখুনি চলে, অযথা ধরপাকড় হয়
মিথ্যা অপবাদে যৌথবাহিনী বা ছাত্ররা করে আক্রমণ –
দেশ স্বৈরাচারমুক্ত হওয়ার রটনা, কেন মিথ্যা নয়?

নৈরাজ্য সর্বত্র, সমাজে সম্প্রীতি নেই, এ ওকে ভয় পায় –
একদল লোক স্বৈরাচারী খুঁজতে নিজেরাই করছে অত্যাচার!
সন্ত্রাসীরা দেশের রাস্তাঘাট, হাট-বাজার রেখেছে দখলে
প্রতিদিন চলে ধর্ষণ-খুন-ডাকাতি; দেশজুড়ে ঘন অন্ধকার।

মনে হয়, যখন ভাল কিছু করতে বা গড়তে নাহি পারো
যা যা আছে তা গুঁড়িয়ে-ভেঙে-পুড়িয়ে বাহবা নিতে চাও?
শত শত অপকর্ম করছ যত্রতত্র, কুফল দেখছ না তাতে
পরকে দোষ দিয়ে করো মিথ্যাচার আর নিজের সাফাই গাও।

হিসাব দেখতে চাই – ধ্বংসকান্ডের ক্ষতিটা টাকায় কত?
কত মানুষ হয়েছে নিহত ও আহত; কত নির্দোষী লাঞ্ছিত?
সন্ত্রাসকান্ডে কত বাড়ি-স্থাপনা, প্রতিষ্ঠান হয়েছে চুরমার
কত অফিস, স্কুল হয়েছে ভাঙচুর, কত কারখানা বিধ্বস্ত?

(বাংলাদেশে আগষ্ট ৫, ২০২৪ পরবর্তী ঘটনার প্রেক্ষিতে)

আলো দেখব কবে

রঙ্গনাথ

মন ভারাক্রান্ত, চতুর্দিক অন্ধকার
ভগ্নহৃদয়ে ভাবি ভরসা নেই আর –
কাঁদতে চাইলে আসে না ক্রন্দন;
পাশে পাই না কোন বন্ধু, স্বজন –
বলতে চাই, "ভেবে কী আর হবে?"
প্রশ্ন করি, "আলো দেখব কবে?"

ঘন অন্ধকারে কোণঠাসা; ভয় পাই
আকুল হৃদয়ে আলো দেখতে চাই –
জানি, আলো থাকে অন্ধকারে ঢাকা
অন্ধকার দূর হলেই পাব তার দেখা;
জানি, সবকিছু উজ্জ্বল হবে যবে
পাব স্বস্তি, অস্থির মনটা শান্ত হবে।

অভীপ্সা

কল্যানী মিত্র ঘোষ

মা চিল তার সদ্যোজাত দুই ছানাকে
ওড়া শেখাচ্ছে
ইউক্যালিপটাসের উঁচু ডালে তাদের বাসা
সকাল এগারোটা তখন
কে জানে বাবাটা কোথায়!
মানুষের মতোই তাদের কারবার
মায়েরই দায় সন্তান প্রতিপালন
এবং স্বাবলম্বী করে তোলার

বাবা চিল সন্ধ্যে নামার আগে বাসায় ফেরে
কোনদিন মুখে থাকে লম্বা সরু কোনো গাছের ডাল
মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টি হলে খসে পড়ে বাসার মেঝেটা, সামাল
দেয় বাবা চিল

সব সামলে বাচ্চাগুলো উড়তে পারছে,
একটা ডাল থেকে মা ডানা ঝাপটে বেরিয়ে ডাকতে থাকে
অমনি পিছু পিছু দুই ভাই নাকি বোন
ভীরু ডানা মেলে দেয়
বৃত্তাকারে ওড়ে তারা তিনজন
এক পথ রোজ রোজ

এদিকে গৃহবধূর হাতে ধোঁয়াওঠা
ভাতের থালা
বাগানে ঘুরে ঘুরে ছেলেকে খাওয়ায়
মনে মনে একাত্ম হয় চিলেদের যাপনে
চিল মা কী করে খুঁজে পেল তার সঙ্গীকে?
চোখে চোখে কথা হয় ওদের?
নাকি নিছক জৈবিক তাড়নায়
নীড় বেঁধেছে দুটিতে

মনুষ্যজন্ম, এই নারী মন
কেন চায় শরীর ছাপিয়ে আরও কিছু?
পরজন্মে চিল হবে সে
ভেবে নেয় বধূটি

অলৌকিক শষ্যচাষ

পৃথা চট্টোপাধ্যায়

তুমি ডাকলে আমি যেতে পারি না,
হাজার নক্ষত্রের ব্যবধান,
নীলগ্রীবা অমেয় পুরুষ
মধ্যরাত আগলে রাখে।

লুকিয়ে রাখি সম্পর্কের নাকছাবি,
ঘুম ভেঙে যায় আচমকা
তোমাকে ছোঁয়ার অনুভবে।
শহরের সিংহরা তখন গাঢ় নিদ্রায়
বাসি সঙ্গমের লালরস
তাদের কষ বেয়ে –

নির্জন অন্ধকারে
অলৌকিক শস্যচাষ
নিয়মিত অভ্যাসের দাস,
বসন্তের রাসলীলা চলে রাতভোর
অস্ফুট শব্দগুলো গড়িয়ে যায়
তুমি ডাকলেও যেতে পারি না।

যখন বাবা আর থাকেন না

লালিত্য ললিত
অনুবাদ: বেবী কারফরমা

যখন বাবা আর থাকেন না
তখন ওঁর ঘর ফাঁকা হয়ে যায়
তাঁর প্রিয় বইগুলো
ঘর থেকে এক এক করে বিদায় জানায়।

তাঁর দাড়ি কাটার বাক্স
নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সরে যায়
পরিবারের লোকজন আপন আপন পছন্দের জিনিস নিয়ে নেয়
কেউ চিরুনি
কেউ ব্লেড কেউ মাজনের সাথে কাঁচিও নিয়ে যায়
বাক্সটা ছোট বাচ্চার অস্থায়ী ব্যাঙ্কে পরিণত হয়
যেখানে সে পেন্সিল, রঙ আর পছন্দের সামগ্রী জমা করে

বাবার শীতবস্ত্রগুলো কোনও গরিবকে দিয়ে দিলেও
মাফলারটা স্মৃতি হিসাবে মেয়ে কাছে রাখে
আর ছেলে টুপিটা পরে নেয়
তাদের অনুভব, বাবা তাদের সাথে আছেন

ছেলে বছরের পর বছর বন্ধ পড়ে থাকা লোহার সিন্দুক খোলে
অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরানোর জন্য
সেই সিন্দুকে পাওয়া যায়
তাঁর প্রথম চাকরি প্রাপ্তি থেকে বর্তমান অবধি
উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রশংসাপত্র আর নিয়োগপত্রও।

ছেলে ভাবে তার বাবা কত পরিশ্রমী ও
কর্মে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন।
প্রতিটি ছেলের মধ্যে তার বাবা নানাভাবে বেঁচে থাকেন
কখনও মননে
কখনও চিন্তায়
কখনও কলমে

ছেলে হঠাৎই পরিণত হয়ে যায়
পরিবারের প্রধান হয়ে ওঠে
বাবা যে দায়িত্ব পালন করতেন
আজ তা ছেলে পালন করে
বাড়ির খাজনা থেকে শুরু করে জল ও বিদ্যুৎ বিল
বাচ্চাদের ইচ্ছা ও তাদের চাহিদা
এমনকি স্ত্রীর সংসারের প্রয়োজনীয় খরচ
মেটানোর প্রতিশ্রুতিও।

ছেলে ভাবে
বাবা কেন চলে গেল
সময়ের আগে
এত দূরে
যেখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না

সকালে চায়ের টেবিলে
বাবাকে নানা বিষয়ে অবগত
করাতো তার ছেলে

আজ বাবা নেই
তবুও মনে হয় এই যেন ঘুরে এসে বলবে
'খোকা আদা, এলাচ দিয়ে চা বানিয়ে দাও
আর ওতে রসও দিও
এতে স্বাদও ভাল হবে সাথে সুবাসও'

ছেলে কিছুদিন চা খাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছিল
কিন্তু পরে আবার চা খাওয়া শুরু করেছে,
পাছে বাবা রাগ করে!
'আমি চলে গেছি বলেই কি
তুমি সকালের চা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছ!'

এখন অনেকেই বলে
তোমার মধ্যে তোমার বাবাকে দেখতে পাই
আমি তখন একটু অবাক হই
আয়নার দিকে তাকাই
সত্যিই কি আমি বাবার মতো দেখতে হচ্ছি?

আজ সন্ধ্যায় বাবার ঘরেই বসে আছি
অনেকক্ষণ
যতক্ষণ না ঘুম আসে

আজও মনে হয় বাবা আমায় ডাকেননি তো!
আমি কি তাঁর ডাক
ঠিকমতো শুনিনি?

বাবা ছাড়া দুঃসময়ে
একান্ত আপন আর নির্ভরযোগ্য
কেউই থাকে না।

বাবার সাথে অনেক কিছুই চলে যায়
সেই স্মৃতি
সেই সব কথাবার্তা আর সেই গল্পগুজব
যা শুনে আমিও খুব মজা পেতাম
আর বাবাও হেসে উঠত

বাবার সাথে চলে গেছে
সেই টক ঝাল মিষ্টি কথার ঝাঁপি
কখনও রেগে গিয়ে
খাবার না খেলে
বাবা এসে বলতেন, 'রাগ হওয়া একটা স্বাভাবিক গুণ
তবে কখনই খাবারকে অসম্মান করবে না।'

আজ কখন যে আমি তাঁর চিন্তায় ডুবে গেছি
সেটা বুঝতেই পারিনি।

ধীরে ধীরে আমার ঘর
আমার বই
আমার পছন্দের জিনিসও বাচ্চারা ভাগ করে নেবে
হয়তো এটাই বাস্তব আর এটাই ভবিতব্য।

বাবার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই
আজ বাবার কথা ভীষণ মনে পড়ছে
তিনি সর্বদা আমাকে আগলে রেখেছেন
নানা পরিস্থিতি ও বিভিন্ন প্রতিকূলতা থেকে।

সময়

তৃপ্তি চক্রবর্তী

দিন আসে দিন যায়
রবে না কিছুই থেমে,
আমার অলস সময় কাটাই
পুরনো স্মৃতি নিয়ে
কত কথাই লিখব ভাবি
কাগজ কলম নিয়ে
লিখতে বসে সব ভুলে যাই
পড়ে না আর মনে
কাগজ কলম রেখে এবার
ভাবতে বসেছি,
আবার যখন পড়বে মনে
লিখব তখন বসে,
এবার আমি নিচ্ছি বিদায়
লেখার ভাবনা ছেড়ে।

বন্ধু

তৃপ্তি চক্রবর্তী

জীবনপথে চলার মাঝে
বন্ধু অনেক জানি
তাই তো এবার সবার মাঝে
ব্রতী হলাম আমি।
পুরনো দিনের অনেক কথাই
আসছে মনে ভিড় করে
নতুন দিনের ভোরের আলোয়
যাচ্ছে তারা দূরে সরে।
ছোট্ট এই জীবনটাতে
শিখলাম অনেক কিছুই
হাত বাড়ালেই বন্ধু
একেই বলে নাকি!

নীলাম্বরের শাপে বর

শান্তনু চক্রবর্তী

হঠাৎ আটষট্টি বছর বয়সে ফায়ার হয়ে গেলেন নীলাম্বরবাবু – ডঃ নীলাম্বর রায়। টেক্সাসের এই অখ্যাত ইউনিভার্সিটির ম্যাথ ডিপার্টমেন্টে ২৫ জন লেকচারারের একজন নীলাম্বরবাবু। দশ বছর আগে ভারতবর্ষের এক ব্যাঙ্কের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এই ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করেছিলেন লেকচারার হিসেবে। তিন মেয়েই যখন একে একে ইউএসএ-তে পিএইচডি করতে চলে এল, তখন মেয়েদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও দেখাসাক্ষাৎ বজায় রাখবার জন্য এটাই ওঁর মনে হয়েছিল একমাত্র পথ। সেসময় এই ডিপার্টমেন্টের চেয়ার ছিলেন একজন বাঙালি – প্রফেসর বীরেন সান্যাল। অ্যাপ্লাই করতেই প্রফেসর সান্যাল তড়িঘড়ি ওঁকে হায়ার করে নেন। এরপর তিন বছর আগে পঁচাত্তর বছর বয়সে প্রফেসর সান্যাল রিটায়ার করলেও নিজের চাকরিটি দিব্যি বজায় রেখে সেমেস্টারগুলো গুটি গুটি পার করে চলেছিলেন নীলাম্বরবাবু। কিন্তু কে জানত হঠাৎ এই অঘটন ঘটবে!

নীলাম্বরবাবুর মতে ওঁর কোনো দোষ নেই। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। এই সেমেস্টারে মঙ্গলবার সকালে ওঁর পরপর তিনটে ক্লাস, বিকেলে কোনো ক্লাস নেই, তবে অফিস আওয়ার রয়েছে – লাঞ্চ করে এসে করবেন। ক্লাস শেষ করে লাঞ্চ করতে যাবেন, তার আগে রুমে ফিরে রোজকার মতো নিজের কম্পিউটারে ওঁর পছন্দের গোটা তিনেক ভক্তিমূলক গান শুনে নিলেন তিনি। সত্তরের দোরগোড়ায় এসে ওঁর মনে হয় চারপাশে নানান পাপের থেকে মনকে কলুষমুক্ত রাখতে এই ভক্তিগীতিই একমাত্র পথ। আজ পান্নালাল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে পরপর তিনটি শ্যামাসঙ্গীত শুনে "ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়" গানটি গুণগুণ করতে করতে লিফ্ট থেকে বেরিয়ে বিল্ডিঙের বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর খানিকটা হেঁটে পার্কিং লটে পা রাখতেই দেখলেন ওঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্রী হেলেন মার্তিনেজকে, সঙ্গে আরও একটি মোটাসোটা মেয়ে। হেলেন দেখতে যেমন ভাল, পড়াশোনায়ও বেশ মেধাবিনী। নীলাম্বরবাবুর কাছে সামারে কলেজ অ্যালজেব্রা এবং প্রিক্যালকুলাস নেবার পর এখন ফলে এসে ক্যালকুলাস নিচ্ছে। এবং এবারেও রীতিমতো ভাল ফলই করে যাচ্ছে। কিন্তু আজ হেলেনকে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল নীলাম্বরবাবুর। পান্নালালের গানের সেই ভক্তিভাব মন থেকে উধাও হয়ে কেমন তেতো লাগল সবকিছু! কী ছোট্ট একটা শর্টস পরেছে হেলেন! ওপরে একটা ছোট্ট ট্যাংক টপ। ওঁকে দেখে হেসে "হাই স্যার" বলল হেলেন। নীলাম্বরবাবু কিন্তু হাসলেন না, উল্টে বললেন, "অ্যান এডুকেশন্যাল ইনস্টিটিউট ইজ আ সেক্রেড প্লেস! ইউ নিড টু ড্রেস আপ ডিসেন্টলি হিয়ার!" হেলেনের হাসি মিলিয়ে গেছে, ও চুপ! নীলাম্বরবাবু আবারও বললেন, "হাউ কাম ইউ এক্সপোজ ইওর নেভাল অ্যান্ড থাইস লাইক দ্যাট! আর ইউ নট অ্যাশেমড?" হেলেন তাও কিছু বলছে না। এরপর উনি শেষ বাক্য বললেন, "নেক্সট টাইম অনওয়ার্ডস ড্রেস-আপ ডিসেন্টলি। বাই!" বলে নিজের গাড়ির দিকে এগোলেন। এই গোটা সময়টুকু অন্য মেয়েটির দিকে একবারও তাকাননি তিনি। তাকালে দেখতে পেতেন সেই মেয়েটি পুরো ব্যাপারটা ফোনের ক্যামেরায় তুলে নিয়েছে।

এরপর নীলাম্বরবাবু বাড়ি গেলেন, লাঞ্চ করে আবার ইউনিভার্সিটিতে এলেন, দুঘন্টা অফিস আওয়ার করলেন। দু'তিনটি স্টুডেন্ট এলে তাদের কাউকে প্রিক্যালকুলাস, কাউকে ক্যালকুলাস বোঝালেন, তারপর শেষের দিকে অনুপ ঘোষালের কণ্ঠে দুটো ভক্তিমূলক নজরুলগীতি শুনে ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। ড্রাইভ করে বাড়ি যেতে যেতে অনুভব করলেন মনের খিঁচড়ে যাওয়া ভাবটা অনেকখানি কমে এসেছে। বাড়ি এসে স্ত্রী, পূর্ণিমার সঙ্গে বসে একত্রে চা খেলেন, গল্প করলেন, তারপর ছ'টা বাজলে তৈরী হয়ে ওঁদের লোকাল হিন্দু মন্দিরে হনুমানজীর আরতি দেখতে গেলেন – প্রতি মঙ্গলবার হয় এই আরতি। আরতি দেখে বাড়ি এসে ডিনার করে টিভিতে একটু নিউজ দেখলেন, তারপর দশটা বাজলে সোজা বিছানায়। ততক্ষণে হেলেনের ব্যাপারটা আর মনে নেই ওঁর।

পরদিন আবার আটটায় ক্লাস। যথারীতি ক্লাসে ঢুকে পড়াতে শুরু করে দিয়েছেন। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ ক্লাস চলবার পর হঠাৎ সেক্রেটারি পামেলা গার্সিয়াকে দরজায় দেখতে পেলেন তিনি। বয়স্কা মহিলা, অনেকদিন থেকে এই ইউনিভার্সিটিতে। দরজার বাইরে বেরোতেই পামেলা থমথমে

মুখে বললেন, “চেয়ার আপনাকে এক্ষুণি ডাকছেন | ইটজ আর্জেন্ট |” নীলাম্বরবাবু কিছু না বুঝেই পামেলার পিছু পিছু লিফ্টে করে ওপরে উঠলেন, কোনো কথা হ’ল না | লিফ্ট থেকে বেরিয়ে চেয়ার, ডক্টর ডেভিড জেনারের রুমে ঢুকতেই ডক্টর জেনার বললেন, “প্লীজ ক্লোজ দ্য ডোর |” নীলাম্বরবাবু দরজা বন্ধ করলেন | ডক্টর জেনার বললেন, “টেক আ সীট!” নীলাম্বর চুপচাপ বসলেন জেনারের মুখোমুখি | বেশী বয়স নয় জেনারের, পঁয়তাল্লিশের নীচেই হবে | কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ | তারপর জেনার বললেন, “ইউ হ্যাভ বিন ফায়ার্ড অন সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট গ্রাউন্ড! ইওর কনট্র্যাক্ট হ্যাজ বিন টার্মিনেটেড ফ্রম টুডে | ডু নট কাম টু স্কুল ফ্রম টুমরো | ইউ মে লীভ দ্য স্কুল রাইট নাও!” নীলাম্বরবাবু বলতে যাচ্ছিলেন, “হাউ? হোয়াই? হোয়াট হ্যাপেনড?” কিন্তু জেনার ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, “আই ক্যান নট সে এনিথিং মোর | দ্য ইউনিভার্সিটি ইজ ইনভেস্টিগেটিং দিস কেস | ইউ উইল হ্যাভ ইওর চান্স টু ডিফেন্ড ইওরসেল্ফ |” তারপর এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, “ইউ মে রিটার্ন ইওর কী টু মিসেস গার্সিয়া | ইওর আইটেমস উইল বি সেন্ট ব্যাক টু ইউ লেটার |”

ডক্টর জেনারের রুম থেকে বেরিয়ে পামেলার হাতে চাবিগোছাটা তুলে দিয়ে লিফ্ট না নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে কোনোরকমে নীচে নেমে এলেন নীলাম্বরবাবু | মাথাটা ঝিমঝিম করছে | সকাল নটাও বাজেনি | এখনো মিনিট সাতেক বাকি | অক্টোবর শেষের সকাল, বাইরে মোটেই গরম নয়, কিন্তু নীলাম্বরবাবুর কপাল, গলা, ঘাড়, বুক-পিঠ, হাতের পাতা – সব ঘামে ভিজে গেছে | কোনোরকমে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলেন; চালিয়ে যে বাড়ি যাবেন, সেটাও মনে হচ্ছে ভীষণ কঠিন কাজ | বাড়িতে পূর্ণিমা ছাড়া কেউ এখন আর থাকে না | মেয়েরা তিনজনেই আলাদা শহরে | এত বড় শকিং নিউজটা পূর্ণিমাকে দিলে ৬৬ বছরের পূর্ণিমা কি নিতে পারবেন? পূর্ণিমা এই খবর শুনে যদি অসুস্থ হন বা জ্ঞান হারান, তখন নীলাম্বরবাবু কি ওঁকে সামলাতে পারবেন? তাছাড়া এই মুহূর্তে হঠাৎ বাড়ি গেলে পূর্ণিমা কী ভাববেন? সোম আর বুধবারে ওঁর একটাই ক্লাস – কলেজ অ্যালজেব্রা | এরপর ওঁর একঘন্টা অফিস আওয়ার রয়েছে | সেটা সেরে তারপর এগারোটা নাগাদ বাড়ি যান তিনি | সেখানে প্রায় দুঘন্টা আগে বাড়ি পৌঁছে গেলে পূর্ণিমা কী ভাববেন? কী অজুহাত দেবেন তিনি পূর্ণিমাকে? তার থেকে বরং এখন বাড়ি না যাওয়াই ভাল | কাছেই ওয়ালমার্ট | সেখানে গাড়ি পার্ক করে একটুখানি বসবেন তিনি | এখন তাঁর নিজের সঙ্গে সময় কাটানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প মনে আসছে না |

ওয়ালমার্টে পৌঁছে পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড়-গলা- কপালের ঘাম মুছলেন নীলাম্বরবাবু | এত তাড়াতাড়ি কী করে এতসব হয়ে গেল? গতকাল বিকেলেই না তিনি হেলেনকে তার ড্রেসের জন্য বকাঝকা করলেন, আর আজ সকালের মধ্যেই খবরটা স্রোতে ভেসে তাঁদের চেয়ারের কাছে চলে এল? কাউকে তার অশ্লীল পোশাকের জন্য তিরস্কার করলেও কি তা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের পর্যায়ে পড়ে? কিছুক্ষণ ভাবলেন নীলাম্বরবাবু | বছর বছর তাঁদের এই সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট সংক্রান্ত ট্রেনিং করতে হয় | হালকাভাবে মনে পড়ছে গত মে মাসেই তিনি এরকম ট্রেনিং করেছেন | সেখানে এটা লেখা ছিল যে কারুর পোশাক নিয়ে কুমন্তব্য করাও সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের মধ্যে পড়ে | কিন্তু ওঁর হেলেনের উদ্দেশ্যে মন্তব্যটা কি সেই পর্যায়ে পড়ে? তিনি তো ওর ভালর জন্যই বলেছিলেন! ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছেন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি বিদ্যার জায়গা, মা সরস্বতীর মন্দিরের মতো | তিনি তো সেই মন্দিরের পবিত্রতাই রক্ষা করতে চেয়েছিলেন! পান্নালালের ভক্তিমূলক গান শুনে মনে যে পবিত্র অনুভূতি জন্মেছিল, সেই অনুভূতিকে এক মুহূর্তে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য হেলেনের ওই পোশাকই যথেষ্ট ছিল | এতই খারাপ লেগেছিল ওঁর যে সেই মুহূর্তে নিজের মনের এই অসন্তোষকে আর চেপে রাখতে পারেননি | আর তার ফল হ’ল এই!

এখনো ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ঠেকছে নিজের কাছে | শেষ পর্যন্ত তিনি সেক্সুয়ালি হ্যারাস করবার দায়ে অভিযুক্ত! অন্য যতসব সেক্সুয়াল প্রেডেটররা রয়েছে, তাদের সঙ্গে তাঁর নিজের কোনো তফাৎ নেই? ভারতে থাকার সময় যেসমস্ত লোকেরা মেয়েদের অকারণে উত্যক্ত করে, মেয়েদের গায়ে অসভ্যভাবে হাত দেয়, তাদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়, এতদিন সেক্সুয়াল অ্যাবিউসার বলে তাদেরই জেনে এসেছেন নীলাম্বরবাবু এবং শুধু তাই নয়, এদেরকে রীতিমতো ঘৃণা করেছেন | তাঁর তিন মেয়েই দেশের স্কুলে বা কলেজে

পড়াশুনো করবার সময় নানাভাবে, নানাবয়সী পুরুষের থেকে অশালীন আচরণের সম্মুখীন হয়েছে – ওঁর নিজের চোখের সামনে এসব হলে তার প্রতিবাদ করতে ছাড়েননি তিনি। শুধু মেয়েদের বেলায় নয়, দীর্ঘ চাকরি জীবনেও তাঁর অধঃস্তন কোনো মেয়ে কলিগ যখন এ ধরনের অসভ্যতার সম্মুখীন হয়েছে, তখন তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন সেই মেয়েটিকে সুবিচার পাইয়ে দেবার জন্যে। আর আজ তিনি কিনা এইসব অশ্লীল, অশালীন আচরণকারীদের সমগোত্রীয় বলে পরিচিত হবেন? এটা কোথাও লেখা থাকবে না যে তিনি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের জন্য চাকরি খুইয়েছেন, কিন্তু এসব কথা তো চাপা থাকবে না! বিশেষ করে এই রিও গ্রান্দে ভ্যালির বাঙালি ও ভারতীয় মহলে কারুর জানতে বাকি থাকবে না এসব। এরপর কি ভারতীয় সমাবেশগুলোতে তিনি মুখ দেখাতে পারবেন? এই ইউনিভার্সিটিতে ওঁর গোটা দুয়েক শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছেন – যেমন ফিজিক্সের ডঃ অনিমেষ ঝা, কেমিস্ট্রির ডঃ সুরিন্দর সিং সোধী...। এঁরা হয়তো এই বিপদে ওঁর পাশেই দাঁড়াবেন। কিন্তু অন্যরা মুখে সমবেদনা জানালেও মনে মনে তো ওঁকে সেক্সুয়াল প্রেডেটর হিসেবেই জানবেন – তাহলে? বিশেষ করে এঁদের বাড়ির মেয়েবউরা! এঁরা নিশ্চয়ই ওঁকে একজন জঘন্য লোক হিসেবেই মনে করবেন। ভাববেন – মেয়ে দেখলেই যেসব বুড়ো হাবড়ারা ছোঁকছোঁক করে, এই লোকটা তাদের মতোই নিকৃষ্ট। ডঃ ঝার স্ত্রী-কন্যা বা ডঃ সোধীর স্ত্রী-পুত্রবধূ – এঁরাও কি তাঁদের স্বামী, পিতা বা শ্বশুরের মতো এতটা দয়াবান হবেন?

মোবাইলে সময় দেখলেন – ন'টা বাহান্ন। এখনো একঘন্টা কাটাতে হবে। এরপর তো বাড়ি যেতেই হবে, পূর্ণিমাকেও বলতে হবে। কিন্তু কীভাবে? কারুর সাহায্য নেবেন কি? ডঃ ঝা বা ডঃ সোধীকে বলবেন কি? নাকি মেয়েদের আগে জানাবেন? ৩৯ বছর বয়সী বড়মেয়ে সোনালী অর্থাৎ চিউ আর ৩৭ বছর বয়সী মেজমেয়ে রূপালী অর্থাৎ মিউ – দুজনেই ক্যালিফোর্নিয়ার দুই ইউনিভার্সিটিতে ইকনমিক্সের টেনিওরড ফ্যাকাল্টি এবং এদের বরেরা অর্থাৎ ডঃ গ্যাবলার এবং ডঃ পিয়ার্সও ঠিক তাই। সোনালীর একটি তিন বছরের মেয়ে আছে, চাবি; আর রূপালীর রয়েছে একটি চার বছরের ছেলে, মোয়া। নিজেদের স্বামী, সন্তান, সংসার, কেরিয়ার নিয়ে দুজনেই বড় ব্যস্ত। বরং ৩৩ বছর বয়সী অবিবাহিতা বর্ণালী অর্থাৎ টিউ এখনো ঝাড়া হাতপা। টেক্সাস এ অ্যান্ড এম কলেজ স্টেশনে অ্যাপ্লায়েড ম্যাথের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর বর্ণালী রায়, পিএইচডি, পোস্ট ডক এবং টেনিওর ট্র্যাকের তিন বছর মিলিয়ে ইতিমধ্যে ৩০-৩৫টি পেপার পাবলিশ করেছে। টিচিং ইভালুয়েশনও দারুণ। তাই বহাল তবিয়তেই আছে টিউ। ছোটবেলা থেকেই বাবার অত্যন্ত ন্যাওটা এই মেয়ে। তাই টিউকেই ফোন করলেন নীলাম্বরবাবু।

টিউ সবটা শুনল মন দিয়ে। তারপর বলল, "বাবা, তুমি দুটো দিন কথাটা চেপে রাখতে পারবে? রোজ যেমন তুমি বের হও, আগামীকাল এবং পরশুও ঠিক তেমনি বেরিও। শুক্রবার আমার ক্লাস নেই। শুক্রবার সকালেই আমি বেরিয়ে পড়ব, দুপুর দুটোয় পৌঁছে যাব তোমাদের ওখানে। তারপর আমার সামনে তুমি মাকে বলবে সবটা। শুক্রবার ক'টায় ক্লাস শেষ হয় তোমার?" নীলাম্বরবাবু জানালেন যে শুক্রবার তাঁর ক্লাস শেষ হতে প্রায় একটা বাজে, এরপর বাড়ি এসে লাঞ্চ করবার পর আর যেতে হয় না, কারণ শুক্রবার তিনি আর অফিস আওয়ার রাখেন না। টিউ বলল, "ঠিক আছে, তাহলে চেষ্টা করব যাতে আমিও একটাতেই পৌঁছে যাই। তারপর যেন কিছুই হয়নি, এভাবে তিনজনে একসঙ্গে বসে লাঞ্চ করব। লাঞ্চের পর তুমি আস্তে করে কথাটা পাড়বে। দিদিদের এখন কিচ্ছু জানাবার দরকার নেই। ঠিক আছে?"

মেয়ের কথায় বুক থেকে অনেকটা ভার নেমে গেল নীলাম্বরবাবুর। এখন মনে হচ্ছে তিনি পূর্ণিমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন। অন্তত টিউয়ের কথা শুনে এটা মনে হচ্ছে না যে সে তার বাবাকে অপরাধী মনে করছে বা সেক্সুয়াল প্রেডেটর মনে করছে। টিউয়ের কথামতো দুটো দিন মুখ বন্ধ রাখলেন নীলাম্বরবাবু। এর মধ্যে যখনই মনে পড়েছে এই দুর্ঘটনার কথা, তখনই হয় পূর্ণিমার কাছ থেকে উঠে অন্য ঘরে চলে গেছেন বা টিভি চালিয়ে দিয়েছেন বা ল্যাপটপে কোনো মুভিতে মগ্ন হয়ে গেছেন অথবা মিউজিক সিস্টেমে গান চালিয়ে তার মধ্যে ডুবে গেছেন। পূর্ণিমাকে ঘুণাক্ষরেও কিছু বুঝতে দেননি। যে আঘাতটা মনে লেগেছিল, ইতিমধ্যেই তার খানিকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ায় ওঁর আর্থিক ক্ষতি হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু অন্য কোনো

শহরে যে এরকম একটা চাকরি তিনি পাবেন না, সেটা তো কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না। চাইলে টিউয়ের ইউনিভার্সিটিতেই হয়তো একটা লেকচারারশিপ জুটে যেতে পারে। আর যদি নাও জোটে, তাহলেও ঠিক আছে। দেশে ৩১ বছর চাকরি করে অনেক সম্পত্তি করেছেন তিনি। আর এখানে ছাত্র পড়িয়ে টাকা উপার্জন করার পাশাপাশি শেয়ারমার্কেটে ইনভেস্ট করেও অনেক মুনাফা কুড়িয়েছেন। তাই জীবনের অন্তিমে এসে এইটুকু আর্থিক ক্ষতির সঙ্গে তিনি সমঝোতা করে ফেলতে পারবেন। কিন্তু একটা বড় ক্ষতি হয়ে গেছে – ওঁর নামে বদনামের কালি লেগেছে! এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তাঁর শিক্ষিতা বিদুষী মেয়ে তো তাঁর পাশে আছে! আর কী চাই! আইনের চোখে অপরাধী হলেও নীলাম্বরবাবুর মতে ভগবানের দুয়ারে তিনি নির্দোষ। একজন পথভ্রষ্টকে সঠিক পথ দেখানো যদি অপরাধ হয় তো তিনি সেই অপরাধে অপরাধী। আশাকরি পূর্ণিমা যখন সব শুনবেন, তখন তিনিও তা মেনে নেবেন।

ব্যাপারটা যদিও অত সহজ হ'ল না। প্ল্যানমতো নীলাম্বরবাবু এদিক ওদিক ঘুরে একটা নাগাদ বাড়ি চলে এলেন। টিউয়ের গাড়িও বাড়ির গাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়াল মিনিট দশেকের মধ্যেই। তিনজনে মিলে পূর্ণিমার রান্না সুস্বাদু মুসুর ডাল, উচ্ছে চচ্চড়ি আর ট্রাউট মাছের ঝোল দিয়ে ভাতও খাওয়া হ'ল। খাওয়া শেষ করে পূর্ণিমা রান্নাঘরের দিকে যেতে গেলে টিউ ওঁকে আটকাল। বলল, "মা, এত তাড়াহুড়োর কী আছে? বসো না একটু!" বলে নীলাম্বরবাবুকে চোখের ইঙ্গিত করল। নীলাম্বরবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "পূর্ণিমা, একটু বসো!" ওঁর গলার স্বরে কিছু একটা ছিল যাতে পূর্ণিমাকে থমকে যেতেই হ'ল। পূর্ণিমা বসলে নীলাম্বরবাবু বললেন, "আমার চাকরিটা আর নেই, পূর্ণিমা!" পূর্ণিমার মুখ হাঁ হয়ে গেল। কোনোরকমে বললেন, "মানে?" এরপর নীলাম্বরবাবু আর কিছু না বলে টিউয়ের দিকে চাইলেন। টিউ শুরু করল। বলল, "মা, বাবা ফায়ার হয়ে গেছে!" পূর্ণিমা "কী করে" বলতে গিয়ে "কী..." বলতেই টিউ বলল, "সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট কেস।" পূর্ণিমা কোনোরকমে বললেন, "তুমিও? শেষ পর্যন্ত তুমিও ওই বিমানবাবু, বিষ্ণু রেড্ডি, পুলক রঞ্জনদের দলে নাম লেখালে? তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল তুমিও অন্য পুরুষদের মতোই? আগে না একদিন খুব গর্ব করেছিলে মেয়েদের যারা অ্যাবিউস করে তুমি তাদের ডেড এগেনস্টে?" নীলাম্বরবাবু কী বলবেন? পূর্ণিমার একবার মুখ ছুটলে কে থামাবে ওকে! টিউ বাবার হয়ে দায়িত্ব নিল; বলল, "মা, প্লীজ একটা কথা শোনো। বাবার দোষ নেই। প্লীজ একটু বোঝো।"

এরপর টিউ ধৈর্য ধরে পুরো ঘটনাটা আস্তে আস্তে ব্যক্ত করল মা'র কাছে। তারপর ম্লান হেসে বলল, "মা, তুমি বাবাকে তো জানো! বাবা দিদিদেরও কোনোদিন ছোট স্কার্ট বা শর্টস পরতে দেয়নি। আমার কথা আলাদা। আমার নিজের এসব ভাল লাগে না বলে কখনো পরিনি। কিন্তু দিদিরা তো পরতে চাইত, বলো! আসলে বাবা যাদের পছন্দ করে তাদের এভাবে দেখতে চায় না!" পূর্ণিমা এরপরও কিছুক্ষণ গোঁজ হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, "ক্ষতি তো যা হওয়ার হয়ে গেছে! চাকরিটা তো গেছে! মুখটা বন্ধ রাখলে কী হতো? এখন লোকজনকে মুখ দেখাব কী করে?" টিউ বলল, "মা, লোকজন বলতে তো ওই সান্যাল আন্টি, ঘোষ আন্টি, দাস আন্টি – এরা? ৩০-৪০ বছর আগে দেশ ছাড়বার পরও এদের মনের বয়স একটুও বাড়েনি। এদের তুমি কেয়ার করো? বরং ওই সোধী আঙ্কল তো বাবার বন্ধু; সোধী আন্টিও খারাপ নয়। ওঁদের বাড়ি গিয়ে কথাবার্তা বললে হয়তো ভাল লাগবে। যাবে?" পূর্ণিমা বললেন, "হ্যাঁ, কথাটা মন্দ বলিসনি! শোনো, তোমার মেয়ে তোমার থেকে অনেক বুদ্ধিমান। সোধীকে বলেছ?" নীলাম্বরবাবু বললেন, "না, এখনো বলিনি।" টিউ বলল, "চলো বাবা, ওঁদের বাড়িতে যাই। সোধী আঙ্কল হয়তো ভাল বুদ্ধি দিতে পারবেন।"

তিনজনে মিলে যাওয়া হ'ল সোধীর বাড়িতে। সোধীরা স্বামী-স্ত্রী, ওঁদের একমাত্র সন্তান লাকি সিং, লাকির স্ত্রী শীনা আর একমাত্র নাতি রন্টি একসঙ্গে থাকে। লাকি আর শীনা টিউয়ের থেকে বয়সে একটুখানি ছোট, দুজনেই একই হাইস্কুলে যথাক্রমে ফিজিক্স আর বায়োলোজি পড়ায়, ওরা ওদের 'টিউদিদি'কে ভেতরে নিজেদের অফিসঘরে নিয়ে চলে গেল। দু'বছরের রন্টি নিজের মনে খেলে যাচ্ছে। তাই টিউয়ের সঙ্গে গল্পে জমে যেতে লাকি-শীনার অসুবিধে হ'ল না। ওদিকে ড্রয়িংরুমে বসে নীলাম্বরবাবু ধীরে ধীরে নিজের জীবনের অভাবিত দুর্ঘটনার গল্প শোনালেন সুরিন্দর সিং সোধীকে। পূর্ণিমা আর সুরিন্দরের স্ত্রী, মাহি নীরব শ্রোতা। সুরিন্দর নীলাম্বরবাবুর থেকে বছর আটেকের ছোট। সব শুনে তিনি বললেন, "ডঃ রয়!

আই অ্যাম রিয়্যালি সরি। অ্যায়সা হোনা নেহি চাহিয়ে থা। অব কেয়া করেঙ্গে আপ?" নীলাম্বর বললনে, "সুরিন্দরজী, আপ হি বাতাইয়ে মুঝে কেয়া করনা চাহিয়ে।"

সুরিন্দর একটুক্ষণ চুপ থেকে যা বললেন, তা হ'ল মন না চাইলেও এখান থেকে নীলাম্বরবাবুকে হয়তো চলে যেতেই হবে। কিন্তু তার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়! নীলাম্বরবাবু চাইলে ইউনিভার্সিটিকে স্যু করতে পারেন। বলতে পারেন – এই দেশ হ'ল ল্যান্ড অফ ইমিগ্র্যান্টস। এখানে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকম মূল্যবোধ নিয়ে বাস করে। সেই মূল্যবোধেরই বশবর্তী হয়ে নীলাম্বরবাবু কথাটা বলে ফেলেছেন। কোনো খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না তাঁর। তাছাড়া সারাজীবন ধরে তিনি মেয়েদের বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। এভাবে বলে যদি কোনো ক্রিমিন্যাল লইয়ারকে কনভিন্স করানো যায় তো সেই লইয়ার কেসটাকে কোর্টে ঠিকমতো প্রেজেন্ট করতে পারবে। সুরিন্দরবাবুর এক থিসিস স্টুডেন্ট ক্রিস্টোফার ভেলা একবার 'হিট অ্যান্ড রান' কেসে ফেঁসে গিয়েছিল – সে হয়তো কোনো লইয়ারকে জানবে। নীলাম্বরবাবুর সামনেই সুরিন্দর ক্রিস্টোফারকে ফোন করলেন। ক্রিস্টোফার একটু বাদেই টেক্সট করে সেই লইয়ারের নাম আর ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিল। লইয়ারের নাম নেইডা কাররিও। নামটা কেমন শোনা শোনা যেন! এখন তো উইকেন্ড পড়ে গেছে। সোমবার পড়লেই নেইডাকে যোগাযোগ করা হবে ঠিক হ'ল।

বাড়ি এসে কোনোরকমে সেদ্ধ ভাত বানালেন পূর্ণিমা এবং খেয়ে চটপট শুয়েও পড়লেন। বাবা ও মেয়ে অনেক রাত অবধি জেগে রইল। মেয়েকে অনেকক্ষণ ধরেই একান্তে চাইছিলেন নীলাম্বর। এবারে তা সম্ভব হ'ল। নীলাম্বরবাবু বললেন, "গোটা ঘটনায় তুই আমার পাশে আছিস দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু অনেস্টলি বল তো – তোর এ ব্যাপারে কী মতামত?" টিউ নীচু হয়ে ফোনে কিছু একটা দেখছিল। ধীরে ধীরে মুখ তুলে বলল, "বাবা, আমার দুঃখ হয় যে এখনকার যুগে বয়স্ক মানুষদের আলাদা কোনো সম্মান নেই। একই আচরণের জন্য একজন অল্পবয়সী মানুষের যা শাস্তি হবে, একজন বয়স্ক মানুষেরও কেন তাই হবে? একজন বয়স্ক মানুষ, যে এখন ৭০-এর দোরগোড়ায়, সে যে মূল্যবোধ নিয়ে বেড়ে উঠেছে, এখন আর তা নেই! মূল্যবোধের সংজ্ঞাটাই পাল্টে গেছে। আগে যাকে আমরা ভাবতাম বড়দের স্নেহের বকুনি, তাই এখন হয়ে গেছে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট।" বলে দু'এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "কিন্তু বাবা, এটাও ঠিক, একজন মানুষ যখন ৭০-এর দোরগোড়ায় এসেও ভাবছে সে এখনো চাকরি করবার উপযুক্ত, সে এখনো তার নিজের এবং তার নিজের স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থ উপার্জনে সক্ষম, তখন যেখানে সে চাকরি করছে, সেখানে তার সহকর্মীরা যে নিয়ম মেনে চাকরি করছে, তাকেও তো সেই নিয়মই মানতে হবে, তাই না?" নীলাম্বরবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমি আমার জন্য আলাদা কিছু চাইছি না। সবাই যা মানবে, আমিও তাই মানব। কিন্তু আমি মেয়েটিকে যা বলেছি, সেটা তো খারাপ কিছু নয়! সেটাকে কেন সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ধরা হবে?" টিউ বলল, "হ্যাঁ, বাবা, তুমি হয়তো তার ভালর জন্যই বলেছ। সেটা তোমার মত। তোমার মতে এরকম পোশাক অন্যায়, অশ্লীল, কিন্তু অন্য অনেকের তো সেরকম মনে হচ্ছে না! তাদের এই পোশাক স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে। সেখানে তোমার কেন অন্যরকম মনে হচ্ছে? এই প্রশ্ন করলে তুমি কী উত্তর দেবে?" একটু দম নিয়ে আবার বলল, "কিছুদিন আগে ভারতের এক মুখ্যমন্ত্রী কোনো মহিলার ফাটা জীনস দেখে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। তখন বিরোধী কোনো এক দলের এক নেত্রী তাঁকে বলেছিলেন 'পার্ভার্ট'। মনে পড়ে?" নীলাম্বরবাবুর মনে পড়ে গেল। ইউএসএ–তে থাকলেও দেশের খবর তিনি খুঁটিয়ে পড়েন। বছর দুয়েক আগের ঘটনা এটা। টিউ কি বলছে তিনি ওই মুখ্যমন্ত্রীর সমগোত্রীয়? বললেন, "মানে, কী বলতে চাইছিস তুই? আমাকেও লোকে তাই বলবে?" টিউ বলে চলল, "বাবা, এখানে সেই মুখ্যমন্ত্রীও হয়তো তাঁর আজন্ম লালিত সংস্কারের বশেই একথা বলেছিলেন; কিন্তু তাঁকে শুনতে হল পার্ভার্ট। অর্থাৎ এখন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে গেছে। এই নতুন দুনিয়ায় সবার সঙ্গে চলতে গেলে তোমাকেও এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।"

নীলাম্বরবাবু আস্তে আস্তে বললেন, "মানছি তোর কথা। কিন্তু আমার কেন খারাপ লাগছে আর অন্যদের কেন খারাপ লাগছে না? সবাই কী করে মেনে নিতে পারছে এসব পোশাকআশাক?" টিউ বলল, "কারণ, তোমরা ছোটবেলা থেকে যৌবন এমনকি মধ্যবয়স, মানে এই ৪০–৪২ বছর অবধি আশেপাশে যেসব

মেয়েদের দেখেছিলে, তারা এরকম পোশাক পরত না| তখন এসব পোশাক সিনেমার নায়িকা বা খলনায়িকা বা মডেল বা বিদেশের মেয়েদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল| দেশে থেকে বিদেশী মেয়ে আর তুমি কোথায় দেখবে? কিন্তু এখন শুধু বিদেশ নয়, ভারতেও অধিকাংশ শহুরে কলেজে এরকম পোশাকেরই ছড়াছড়ি | তোমাদের বলা হয়েছিল এসব পোশাক খারাপ, যৌনউত্তেজক এবং কেন যৌনউত্তেজক তাও বলা হয়েছিল| সেটাই তোমরা জেনে এসেছ, বুঝে এসেছ| কিন্তু অনেকে হয়তো কম বয়স থেকেই এ ধরনের পোশাক পরা মেয়েদের সঙ্গে ওঠাবসা করে এসেছে, তাদের কাছে এসব কিছুই নয়| তাদের এসব পোশাক দেখলে কিছু হয় না; কিন্ত তোমার মতো লোকেদের হয়|" নীলাম্বরবাবু বললেন, "তাহলে ভাল না লাগলেও চুপ করে থাকতে হবে – এটাই কি এ যুগের নিয়ম?" টিউ মৃদু হেসে বলল, "বাবা, তোমার ভাল না লাগতেই পারে, কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছ – তোমাকে মুখ বন্ধ রাখতে হবে| ও তোমার ছাত্রী| ওর সঙ্গে তোমার বিদ্যাদান আর বিদ্যাগ্রহণের সম্পর্ক| এখানে অন্য কোনো ব্যাপারে কথা বলার তোমার যেমন রাইট নেই, ওরও নেই| সেটা হ'ল ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ| এখনকার যুগে একটা লিখিত বা অলিখিত নিয়ম – কারুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলবে না|" নীলাম্বরবাবু মাথা চুলকে বললেন, "তাহলে আগে গুরুরা তো ছাত্রছাত্রীকে কত কিছু বলতেন!" টিউ বলল, "এখনও বলেন – তবে সেটা স্কুলে – যখন ছেলেমেয়েরা অ্যাডাল্ট হয়নি! সেটাও একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি বজায় রেখে| স্কুলে সাধারণত ইউনিফর্ম থাকে| সেখানে ড্রেসকোডের জন্য বলতেই হয় | কিন্তু এখানে একজন অ্যাডাল্টকে তুমি এরকম বলতে পারো না|"

নীলাম্বরবাবু বললেন, "তাই বলে আমাকে একেবারে ফায়ার করে দিল? এর থেকে বড় কিছু হলেও তো সেই ফায়ার-ই হতে হতো!" টিউ বলল, "হ্যাঁ, আমিও মনে করি এটা বাড়াবাড়ি হয়েছে| এগুলো সবই কেস বাই কেস বেসিসে দেখতে হবে| সবগুলোতেই এক শাস্তি হওয়া সত্যিই উচিত নয়|" নীলাম্বরবাবু বললেন, "তার মানে তুই বলছিস আমার একটা ন্যূনতম শাস্তি হওয়া উচিত?" টিউ বলল, "একটা কথা ভেবে দেখো বাবা! তুমি তো মেয়েটিকে ওসব বলে লাঞ্ছ করতে চলে গেলে| তারপর ফিরে এসে পরম শান্তিতে অফিস আওয়ার করলে, গান শুনলে, বাড়ি এসে চা খেলে, মাকে নিয়ে মন্দিরে গেলে, বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে সব ভুলে ঘুমিয়ে পড়লে! কিন্তু একবার ভাবো তো সেই মেয়েটির কথা! তার কেমন লেগেছিল এসব শুনে? যে টিচারকে সে এত ভালবাসে, যাঁর কাছে ভালবেসে সে পরপর তিনটে কোর্স নিয়েছে, তিনি তাকে কেন ওরকম ইনসাল্ট করলেন? ভেবে দেখেছিলে – তার সারা বিকেল, সন্ধ্যে কেমন কেটে থাকতে পারে? বিশেষ করে যদি সে একজন সেন্সেটিভ মেয়ে হয়? সে তো ভাবতেই পারেনি যে এটাকে কেউ ইন্ডিসেন্ট পোশাক ভাবতে পারে! সে জন্ম থেকে এরকম পোশাক পরেছে| শুধু তাই নয়, আশেপাশে নিজের মা-মাসি-পিসি-বোন-কাজিন-বন্ধুবান্ধব – সবাইকে এমনটা পরতে দেখেছে! কেন এটা খারাপ হবে? কেন ওকেই শুধু এসব শুনতে হবে?" নীলাম্বরবাবু বললেন, "কিন্তু আগে যখন টিচাররা এরকম বলতেন, তখন তো কোনো শাস্তি হতো না তাঁদের! ছাত্রছাত্রীরাও নিজের ভুল মনে করে চুপ করে যেত|" টিউ বলল, "কিন্তু তাই বলে কি তারা কষ্ট পেত না? ইনসাল্টেড ফীল করত না? করত কিন্তু উপায় নেই বলে চুপ করে থাকত| সেটা কি ভাল হতো, বলো তুমি? সেজন্যই এই আধুনিক পৃথিবীতে এই অলিখিত নিয়ম হয়েছে যে কেউ কারুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না| এতে অনেক ইনসাল্ট, অনেক কন্ট্রোভার্সি, অনেক মনকষাকষি কমে যায়| ফায়ার করে দেওয়াটা বাড়াবাড়ি, কিন্তু আমার মতে যারা এরকম অন্যের স্বাধীনতায় হাত দেয়, তাদেরকে তো মিনিমাম একটা শাস্তি পেতেই হবে! দু'সপ্তাহ সাসপেন্ড বা আপ টু ১০০০ ডলার জরিমানা এবং ম্যান্ডেটরি কাউন্সিলিং – এরকম কিছু|"

নীলাম্বরবাবু একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, "আচ্ছা, তাহলে একটা কথা বল! যদি মানুষের যা খুশী পরবার রাইট আছে, তাহলে অনেক চার্চে কেন রিভিলিং পোশাক অ্যালাও করে না?" টিউ বলল, "সেখানেও সেই ড্রেস কোডের ব্যাপার| স্কুলে যেমন ইউনিফর্ম রয়েছে বাচ্চাদের জন্য, তেমনি সেসব চার্চে ড্রেস কোড রয়েছে সবার জন্য|" নীলাম্বর বললেন, "তাহলেই দেখ, সেখানে কি আর সময়ের সঙ্গে সবকিছু বদলেছে? মন্দির-মসজিদ-গুরুদুয়ারার কথা ছেড়েই দিলাম, এই আমেরিকার মতো আল্ট্রামডার্ন দেশের চার্চেই যদি অ্যালাও করছে না, তাহলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা কিছু আছে?" টিউ বলল,

"একশোবার। নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তুমি বলবার কেউ নও। যে কর্তৃপক্ষ ওরকম নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, তাঁরা ওটা দেখবেন। অনেক চার্চও কিন্তু রিভিলিং পোশাক নিয়ে কিছু বলে না। এক এক চার্চে এক একরকম ব্যবস্থা।" নীলাম্বরবাবু বললেন, "ইউনিভার্সিটিগুলোও তো ওরকম করলে পারে। শিক্ষাদান আর শিক্ষাগ্রহণও তো পবিত্র কাজ, সেখানে কেন এরকম হবে?" টিউ হেসে বলল, "বাবা, তুমি নিজেই তো বলো – আজকাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান – এসব আগে যেমন ছিল, তেমন আর নেই। সবই এখন বাজার। প্রতিনিয়ত কেনাবেচা চলছে। বাজারে তো মানুষ যা খুশী পরতে পারে, তাই না? ওসব আদ্যিকালের ধ্যান-ধারণা এখন আর চলে না। স্টুডেন্টদের কথা ছাড়ো, কজন টিচার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বাজার ছাড়া অন্যকিছু ভাবে? সেও তার পড়ানোকে বিক্রি করতে এসেছে – এমনটাই তো ভাবে, তাই না?"

নীলাম্বর বললেন, "একটা কথা আমাকে অনেস্টলি বল; তোর নিজের কী মনে হয় এইসব রিভিলিং পোশাকের ব্যাপারে?" টিউ বলল, "একটা কথা নিশ্চয়ই শুনেছ, বাবা। নিজেকে ক্যারি করা! এটাই বলা হয়ে থাকে যে কেউ যদি নিজেকে ক্যারি করতে পারে তো রিভিলিং পোশাকেও আপত্তি নেই। কিন্তু কেউ যদি ওরকম পোশাক পরে নিজেই অস্বস্তিতে পড়ে যায় তো সে নিজেকে ক্যারি করবে কী করে? অনেক মেয়েকে দেখবে কদাচিৎ এরকম পোশাক পরে, কিন্তু যখন পরে, তখন কনফিডেন্টলি চলাফেরা করতে তাদের অসুবিধে হয় না। সে শাড়িতে যেমন স্বচ্ছন্দ, বিকিনিতে বা টু-পিসেও তাই! এই স্বাচ্ছন্দ্য বোধটাই নিজেকে ক্যারি করা। অর্থাৎ তার পোশাকের সচেতনতার উর্ধ্বে গিয়ে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। ধরো কোনো স্টুডেন্ট তোমার কাছে ক্যালকুলাস বুঝতে এসেছে হেলেনের মতো পোশাক পরে; সে এসে নিজের ব্রায়ের স্ট্র্যাপ বারবার ঠিক করছে বা বসার পজিশন সমানে বদলাচ্ছে অথবা মিনিস্কার্ট পরলে বারবার সেটাকে হাঁটু অবধি টানার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, তাহলে সে নিজেকে ক্যারি করতে পারছে না। এমন অনেক মেয়েকে আমি দেখেছি যারা ছোট পোশাক পরে আছে আর প্রচন্ড হাওয়া বইলে কোনোরকমে জামাটাকে সামলাচ্ছে। সেক্ষেত্রেও সে নিজেকে ক্যারি করতে পারছে না। কিন্তু সেই স্টুডেন্ট যদি নিজের ব্রা-শর্টসের কথা ভুলে গিয়ে সরাসরি ক্যালকুলাসে মন দিতে পারে, যদি শর্ট ড্রেসের তলায় একটা শর্টস পরে, তাহলে হাওয়ায় জামা উড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না আর নিজেকে ক্যারি করতেও সুবিধে হয়।" বলে একটুখানি হি হি করে হাসল টিউ। বলল, "একটু বেশী বলে ফেললাম, তাই না বাবা?" নীলাম্বরবাবুও হেসে বললেন, "ভালই তো বলেছিস।" টিউ বলল, "অনেক রাত হয়ে গেছে; পৌনে একটা। শুয়ে পড়ো গিয়ে।" নীলাম্বরবাবু বললেন, "আসল কথাটাই তো বললি না। তোর নিজের কি এসব পোশাক পরতে ইচ্ছে করে না? মনে হয় না যে আমি দেখিয়ে দেব কীভাবে নিজেকে ক্যারি করতে হয়?"

টিউ এবার একটুখানি সিরিয়াস হ'ল, বলল, "মেয়েদের অবজেক্টিফিকেশনের কথাটা তো নিশ্চয়ই শুনেছ বাবা? এই যে নানানরকম প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপনে মিনিম্যাল কাপড়জামা পরা মেয়েদের দেখা যায়, সেখানে কি মেয়েরা নিজেদের ক্যারি করতে পারে না? অনেক ক্ষেত্রেই পারে। তেমনি নানানরকম বিউটি কন্টেস্টে কিছু কিছু রাউন্ডে যা হয়, তাতেও আমরা মেয়েদের অবজেক্টিফিকেশনই দেখতে পাই। সেখানেও যারা টপ পারফরমার, তারা নিজেদের ভালই ক্যারি করতে পারে। কিন্তু তা সত্বেও ইন্ডিয়াতে থাকার সময় আমার ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে যখন গল্প হতো, তখন শুনতাম ছেলেরা নিজেদের মধ্যে সেইসব মেয়েদের নিয়ে কী ধরনের আলোচনা করত। সেইসব আলোচনায় মেয়েটি কোনো অবজেক্ট বা বস্তু থেকে বেশী কিছু নয়। সুরিয়াংশও তো তাই বলে! যাক, সে কথা। আসলে ইন্ডিয়ান বা দেশী ছেলেরা যেসব মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে বড় হয়, তাদের জন্য এই মেয়েরা বস্তু। কিন্তু এই অব্জেক্টিফিকেশন কথাটা তো দেশী নয়, এটা পাশ্চাত্য থেকেই প্রাচ্যে গেছে। তোমরা হয়তো ইয়ং বয়সে এই শব্দটা শোনোইনি। তাছাড়া আমার আর একটা জিনিস মনে হয়। মেয়েরা তাদের শরীরকে সুন্দর করবার জন্য কত কী করে! আর সেই সুন্দর শরীর সবার সামনে মেলে ধরবার জন্য নানারকম পোশাক পরে – স্ক্যান্টিলি ড্রেস্ড হওয়ার স্বপক্ষে এটাও একটা যুক্তি। ছেলেদের পোশাকে সে তুলনায় বৈচিত্র্য কম, আর শরীরকে মেলে ধরবার মতো পোশাকের সংখ্যা তো আরও কম। খেলাধুলো বা মিস্টার ইউনিভার্স কম্পিটিশন ছাড়া সেভাবে ছেলেরা পাবলিক প্লেসে শরীরকে সেভাবে মেলে ধরে না। মেয়েরা কিন্তু তাদের সুন্দর

শরীরের অজুহাতে সেই ছাড়পত্র পেয়ে যায়। আর আমার মনে হয়, এই করতে গিয়ে অনেক সময় তারা হয়ে যায় অব্জেক্টিফায়েড। মোদ্দা কথা, যে পোশাক পরলে একটি মেয়ে অবজেক্ট বা বস্তুতে পরিণত হয়, সেই পোশাক আমি কেন পরব?"

নীলাম্বরবাবুর মনটা প্রশান্তিতে ভরে গেল। তিনি মানতে পারছিলেন না এসব পোশাক। অথচ কী যুক্তি নিজেকে জোগাবেন সেটাও ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাঁর মেয়েই তাঁর সমর্থনে যুক্তি এগিয়ে দিল। হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। টিউ হেসে বলল, "ওমনি হাসি ফুটল তো? হ্যাঁ বাবা, আমিও এসব পোশাক পরতে ভালবাসি না, কাউকে পরতে দেখলে আমার ভালও লাগে না। কিন্তু তাই বলে আমি কোনোরকম বিরূপ মন্তব্য করতে যাব না, কারণ এটা তার রুচি ও স্বাধীনতা। আমার কোনো স্টুডেন্ট এরকম পোশাক পরলে আমি কিছু বলব না। জানি, মেয়েদের জন্য এটা সহজ। একটা মেয়ে স্ট্রেট হলে তার তো আরেকটা মেয়েকে ওভাবে দেখে কোনো রকম যৌনউত্তেজনা হবে না। তবে নিজের রুচি বা সংস্কারের জন্য হয়তো বলে ফেলার ভয় থাকে। কিন্তু একটা ছেলের বেলায় রুচি বা সংস্কার ছাড়াও আরেকটা জিনিস থেকে যায় – তা হ'ল যৌনউত্তেজনা। সেটা আরও বড় সমস্যা। ঠিক আছে, আর না বাবা! ঘুমোও গিয়ে।" নীলাম্বরবাবু বললেন, "ঠিক আছে, যাচ্ছি; শুধু বলে যা সুরিয়াংশের লাস্ট নামটা কী?" টিউ লাজুক হেসে বলল, "প্যাটেল। তবে গুজ্জু হলেও বিজনেসের 'ব'-ও বোঝে না সে। ও কম্পিউটার এঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফ্যাকাল্টি। আমি ঘুমোতে চললাম। একটা পঁচিশ।"

নীলাম্বরবাবু বিছানায় শুয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন মেয়ের কথা। একটা কথা সে বলতে গিয়েও বলেনি – নিজের বাবার যৌনউত্তেজনার কথা। হ্যাঁ, ওঁর হেলেনকে দেখে যৌন-উত্তেজনা হয়েছিল বৈকি! শুধু হেলেন নয়, এই দশ বছরে ক্যাম্পাসে অগুনতি মেয়েকে তিনি এরকম ছোট্ট শর্টসে দেখেছেন, প্রতিবারই তাঁর একইরকম যৌনউত্তেজনা হয়েছে, এখনো হয়। কিন্তু কখনো কিছু বলেননি। কিন্তু হেলেনের বেলায় বলে ফেললেন। আসলে হেলেনের ওপর তাঁর যেন একটা অধিকারবোধ জন্মে গিয়েছিল। এই অধিকারবোধই তাঁর সর্বনাশ ডেকে আনল। পান্নালালের ভক্তিগীতি শুনে বেরিয়ে এসে যখন হেলেনকে তিনি ওইভাবে দেখলেন, তখন মনের ভক্তিভাবকে ওভারপাওয়ার করে নিয়েছিল যৌনউত্তেজনা। ভক্তিভাবের এই শোচনীয় হারকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। সেজন্য হেলেনকে উদ্দেশ্য করে যা বলেছিলেন, তা ছিল তাঁর এই না মানতে পারার বহিঃপ্রকাশ।

পরদিন অর্থাৎ শনিবার দিনটা আর এসব নিয়ে তিনজনের কেউই কথা বললেন না। লাঞ্চে একটা ভাল রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়া হ'ল। টিউই খাওয়াল। এরপর সন্ধ্যেবেলা মন্দিরে আরতি দেখতেও যাওয়া হ'ল। রাত্রে আজ তিনজনেই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন। আগের রাত্রে তিনজনেরই ঘুম কম হয়েছিল। নীলাম্বরবাবু এবং টিউ দুজনেই দেরীতে শুয়েছিলেন। সকাল সাতটায় রান্নাঘরে বাসনপত্রের শব্দে বাবা-মেয়ে দুজনেই জেগে যান। পূর্ণিমারও ভোর সাড়ে চারটেতেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। যে দুর্বিপাক সংসারে ঘনিয়ে এসেছে, তার পরিণতি কী হবে ভেবে কোনো কুলকিনারা তো তিনি পানইনি, উল্টে ঘুমটা মাটি হ'ল। আড়াই ঘন্টা এভাবে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকার পর উঠে রান্নাঘরের কাজ শুরু করে দেন। সেজন্য আজ রাত দশটাতেই তিনজনে শুতে চলে গেলেন এবং ঘুমিয়েও পড়লেন তাড়াতাড়ি।

এর পরদিন রবিবার। সকাল হতেই টিউয়ের চলে যাওয়ার তাড়া। পূর্ণিমা চটপট রান্না সেরে সকাল সাড়ে এগারোটাতেই মেয়েকে খেতে দিয়ে দিলেন। টিউ খেয়েদেয়ে সোয়া বারোটায় বেরিয়ে যাবার আগে ভাল করে বাবাকে বলে গেল লইয়ারকে সব বুঝিয়ে বলতে এবং কেসে জেতার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে। আর মাকে বলল ভেঙে না পড়ে স্টেডি থাকতে। টিউ চলে গেলে নীলাম্বরবাবুর মনে হ'ল তাঁর নিজের জোরের জায়গাটাই চলে গেল। তবু মনে মনে টিউয়ের কথাগুলো আউড়ে নিয়ে পরের দিনের জন্য তৈরী হলেন। বিকেল পাঁচটার মধ্যে নিজের কর্মস্থলে পৌঁছে টিউ আবারও ফোনে নীলাম্বরবাবুকে পরের দিনের জন্য তৈরী হতে বলল। সারা সন্ধ্যেটা শূন্য ঘরে স্বামী-স্ত্রী চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মুখোমুখি বসে নীরবে কাটিয়ে দিলেন।

পরদিন সকাল থেকেই শুরু হ'ল তৎপরতা। ডঃ সোধীর ছাত্র আগেই নেইডা কাররিওকে বলে রেখেছিল। কথামতো ঠিক সকাল দশটায় কাররিওর অফিসে গিয়ে

পৌঁছালেন নীলাম্বরবাবু। এবং নেইডাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কেন নামটা শুনে চেনা লেগেছিল বুঝতে পারলেন তিনি। মুখটাও চেনাচেনা। তবুও যেটুকু সন্দেহ ছিল, নেইডা এক লহমায় দূর করে দিল। হেসে বলল, "স্যার, ইউ হ্যাভ নট চেঞ্জড এ বিট। ডু ইউ রিমেম্বার মি?" বলে সে নিজেই পরিচয় দিল। সেটা ছিল ২০১৩-র ফল সেমেস্টার। সেটাই ছিল নীলাম্বরবাবুর এই ইউনিভার্সিটিতে প্রথম পড়ানো আর সেটা নেইডার জন্যও ছিল প্রথম সেমেস্টার। কলেজ অ্যালজেব্রা নিয়েছিল সে নীলাম্বরবাবুর কাছে। প্রায় প্রত্যেক পরীক্ষাতেই নিখুঁত উত্তর লিখেছিল। তারপর ২০১৭-তে নাকি সে ক্রিমিনাল জাস্টিস নিয়ে গ্র্যাজুয়েট করে। এরপর এক বছর জোর কদমে এলস্যাটের প্রিপারেশন নেয় এবং ২০১৮-তেই ভর্তি হয়ে যায় ইউ টি অস্টিন ল স্কুলে। ২০২২-এ পাশ করে বেরিয়ে সে ফিরে আসে এই ভ্যালিতে। জয়েন করে এই কাভাসোস ল ফার্মে – একজন ক্রিমিন্যাল লইয়ার হিসেবে। ইতিমধ্যেই সে বেশ সুনাম কুড়িয়েছে। নীলাম্বরবাবু দেখলেন সেদিনের অষ্টাদশী কিশোরী এখন বছর আটাশের এক ঝকঝকে আত্মবিশ্বাসী যুবতী। মনে হ'ল এর ওপর ভরসা করা যায়।

নেইডা সবটা শুনল মন দিয়ে। বলল – ভারতীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, সঙ্গীত, পালাপার্বণ নিয়ে তার অনেকটা জানবার সুযোগ হয়েছে অস্টিনে থাকাকালীন। ওর বেশ কিছু ভারতীয় বন্ধু ছিল সেখানে। তাছাড়া ইন্টারনেট ঘেঁটেও সে অনেকটা জেনেছে। দরকার হলে আরও জানতে ওর কোনো আপত্তি নেই। এতটা জানে-বোঝে বলেই নীলাম্বরবাবু কোন মানসিকতা থেকে এমনটা করেছেন তা বুঝতে নেইডার এতটুকুও অসুবিধে হ'ল না। বলল ও যথাসাধ্য করবে নীলাম্বরবাবুর জন্য। কেসটা যতটা সম্ভব যত্ন নিয়ে প্রিপেয়ার করা যায়, তাই করবে ও। নীলাম্বরবাবু যদি এ ব্যাপারে কিছুটা সহায়তা করতে পারেন তাহলে আরো ভাল হয়। যেমন দেশে থাকতে তিনি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সব লাঞ্ছিতা মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সেসব মেয়েদের রেকর্ডেড বয়ান যদি জোগাড় করা যায় তো খুব ভাল হয়।

পরের তিন-চার মাস নেইডা যেমন খাটল, নীলাম্বরবাবুও ততটাই খাটলেন। সব সাক্ষ্য-প্রমাণ যথাসাধ্য জোগাড় হ'ল। যেসব পরিচিত মেয়েদের পাশে একসময় নীলাম্বরবাবু দাঁড়িয়েছিলেন, তারা নির্দ্বিধায় তাদের রেকর্ডেড বয়ান পাঠিয়ে দিল। তিনি সেগুলো নেইডার হাতে পৌঁছে দিলেন। এরপর দিন পনেরো উদয়াস্ত পরিশ্রম করে নেইডা কেস সাজাল এবং দিনক্ষণ দেখে নীলাম্বরবাবু স্যু করলেন ইউনিভার্সিটিকে। শুরু হ'ল শুনানির পর শুনানি। ইতিমধ্যে ইউনিভার্সিটিতে নীলাম্বরবাবুকে ডেকে একবার প্রসিকিউট করা হয়ে গেছে। সেখানেই তিনি জেনেছেন যে সেদিন হেলেনের সঙ্গের মেয়েটি, যার নাম ডেনিসে গেরেরো, সে-ই ভিডিওটা যথাস্থানে জমা করেছিল। আর তারপর নানান চ্যানেল হয়ে নীলাম্বরবাবুদের চেয়ার ডঃ জেনারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সেদিন প্রসিকিউশনের সামনে নেইডার কথামতো নীলাম্বর প্রায় চুপই ছিলেন, শুধু একটাই কথা বলেছিলেন যে তিনি এই ফায়ার হয়ে যাওয়া ব্যাপারটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। যাইহোক, এরপর কোর্টে শুনানি শুরু হ'ল। ইউনিভার্সিটির উকিল দুঁদে, পোড়খাওয়া, বয়স্ক লোক। তাঁর নাম ডগলাস ফেরেরো। ওঁর কৌশলের কাছে নেইডা বেচারিকে শেষমেশ হার স্বীকার করতেই হ'ল। অনেক চেষ্টা করেও কেসটা বার করে আনতে পারল না নেইডা। তবে নেইডার নাছোড়বান্দা মনোভাবের জন্য একটা থোক টাকার চেক তুলে দেওয়া হ'ল নীলাম্বরবাবুর হাতে – ৫০,০০০ ডলার। সেটাই বা কম কী? নীলাম্বর ও পূর্ণিমা প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন নেইডাকে।

এবারে যাবার পালা। কেস জিতলেও নীলাম্বরবাবু এখানে থাকতেন না। এখানে চাকরি করবার ইচ্ছেটাই চলে গিয়েছিল তাঁর। শুধু চেয়েছিলেন নেইডার সাহায্যে লড়াইটা জিততে। তার জন্যই এই কোর্ট কেস, এই খাটাখাটুনি। জেতা হয়নি – সেটা অন্য ব্যাপার। মোট কথা এখান থেকে তিনি সরতেই চেয়েছিলেন। সেজন্য টিউয়ের কথামতো তিনি টেক্সাস এ অ্যান্ড এম কলেজ স্টেশনে লেকচারারের জন্য অ্যাপ্লাই করেই রেখেছিলেন। নতুন বছর অর্থাৎ ২০২৫-এর স্প্রিং সেমেস্টার থেকে চাকরিটা হয়ে গেল। খ্রীস্টমাসের ছুটির পরই চলে এলেন কলেজ স্টেশনে। তাই বলে ভ্যালির বাড়ি সঙ্গে সঙ্গে ছাড়লেন না। মেয়ের বিয়ে যে! টিউয়ের যে তাই ইচ্ছে! সেজন্য স্প্রিং ব্রেকের ঠিক আগের সপ্তাহে আবার সবাই ফিরে এলেন ভ্যালির বাড়িতে। স্থানীয় মন্দিরের পন্ডিতজী কল্যাণকুমারের পৌরোহিত্যে বিয়ে হয়ে গেল ডঃ বর্ণালী রায় ও

ডঃ সুরিয়াংশ প্যাটেলের। এরপর স্প্রিং ব্রেক শেষ হবার দুদিন আগেই মেয়ে-জামাইসহ আবার কলেজ স্টেশনে ফিরে এলেন নীলাম্বর ও পূর্ণিমা।

বদনামের ভাগীদার হয়ে চাকরিটা খোয়ালেও একটা জিনিস নীলাম্বরবাবু জীবনেও ভুলবেন না। ২০২৩ সালের সেই শুক্রবারের রাতটিকে। সেদিন বাবা ও মেয়ের মধ্যে এক সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। ২৭শে অক্টোবরে রাত সাড়ে দশটায় সেই আলোচনা শুরু হয়ে ২৮শে অক্টোবর সকাল প্রায় দেড়টায় শেষ হয়েছিল। নিজের ছোট মেয়েকে সেদিন নতুন করে চিনেছিলেন নীলাম্বরবাবু। আর নেইডার সঙ্গে দীর্ঘ এক বছরের অসংখ্য মিটিংয়ের পর নেইডা হয়ে গিয়েছিল তাঁর আর একটি মেয়ে – তাঁর চতুর্থ মেয়ে। ওরকম বদনামের ভাগী না হলে কি এই দুটি বড় লাভ তাঁর হতো!

বৃষ্টি নামে

বিষ্ণুপ্রিয়া

১

গভীর রাতে বৃষ্টির শব্দ অন্যরকম লাগে। একই ঘ্যানঘ্যানে শব্দের পুনরাবৃত্তি হয় জানলার কাঁচে। এই সময় ব্যাকইয়ার্ডে লাল, হলদে, কমলা, আর মরচে রঙের ঝরাপাতার কার্পেট বিছানো। হেমন্তের বৃষ্টিভেজা মরাপাতার এক অদ্ভুত বিষণ্ন গন্ধ থাকে, আসন্ন শীতের আভাস জড়ানো। কিছুদিনের মধ্যেই ঝপ করে শীত নামবে। প্রথমে ঘাস গায়ে জড়াবে হালকা ফ্রস্টের ফ্যাকাশে চাদর। তারপর হুড়মুড়িয়ে আসবে বরফ বৃষ্টি আর বরফের জমাট ঠান্ডা। এখন রাতে বেশ ঠান্ডা লাগে। হীটিং চালাতে হয়।

ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার হাতড়ে আলোর সুইচ খুঁজে পেতে কিছুটা সময় লাগল। বেডল্যাম্পের অল্প আলোয় মণিদীপা দেখল ঘড়িতে ২:৩০। পাশে ধীমান নেই। গেল কোথায়? বাথরুমেও কোন সাড়াশব্দ নেই। বিয়ের তিন বছরের মধ্যে ও অনেক রাতেই টের পেয়েছে ধীমান পাশে নেই। হয়তো সিগারেট ধরিয়ে পাশের বেডরুমের জানলার বাইরে রাতের তারা গুনছে স্মোক ডিটেক্টরকে ফাঁকি দিয়ে। তা না হলে এখুনি অ্যালার্ম বেজে উঠবে আর দমকল ও ফার্স্ট রেসপন্ডররা এসে উপস্থিত হবে। উটকো ঝামেলা! কিছুতেই সিগারেটের পুরনো অভ্যেসটা ছাড়তে পারে না ও। এই অভ্যেস আর নেশার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে?

এত রাতে উঠে ঘুম নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। জ্বলন্ত টুকরোটা শেষ হলে নিজেই এসে ঘুমিয়ে পড়বে। বলিহারি যাই! সকালে উঠে ধীমানকে বলতেই হবে, ‘জানিসই তো, প্রেগন্যান্ট অবস্থায় প্যাসিভ স্মোকিং কতটা ক্ষতিকর। এত দায়িত্বজ্ঞানহীন হলি কী করে বুঝি না!’

মণিদীপা কমফর্টরটা ভাল করে গলা পর্যন্ত টেনে নিল। ওজন এখন এত বেড়ে গেছে যে ভারি শরীর নিয়ে নড়তে চড়তে বেশ সময় লাগে। এখন থেকে মেটার্নিটি লীভ নেওয়ার কোন মানে হয় না, কারণ পরের দিকেই ছুটির বেশি প্রয়োজন হয়। ঘুম না হলে শরীর ম্যাজম্যাজ করে সারাদিন; ড্রাইভিং, কাজ, সবেতেই অসুবিধে হয়। তাই পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করল মণিদীপা।

২

অনেক দূরে কোথাও মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। সেই বৃষ্টি এখন মণিদীপার মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। বৃষ্টিকণা কাঁচের টুকরোর মতো খানখান হয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে আর ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। কখন যে বৃষ্টির জল আর চোখের জল মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায় টেরই পায় না মণিদীপা। ওর একলা মনটা বড্ড নিশ্চুপ। একা না হতে চাইলেও একা। ভীষণ একা। মানুষ যে একা, ও তা জানে। Existentialism-এর মূলে মানুষের এই একাকিত্ব। বুদ্ধের শূন্যবাদ নিয়ে কত আলোচনা হয়েছে ওর আর ধীমানের। মেঘও কত দূরে, কী ভীষণ একা! ওরই মতন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ মেঘের একাকিত্ব বুঝতে পারতেন। কবিরা হয়তো একাই পথ চলতে ভালবাসে, তাই মেঘকে আপন করে নেয়। কিন্তু বইয়ে পড়া এক ব্যাপার; আর তাকে মনে ধারণ করে পথচলা আরেক। মণিদীপা কখনো পারে একলা চলতে, আবার কখনো হোঁচট খায়, ব্যথা পায়।

অথচ এমন হবার কথা ছিল না। মনে হতো সব তো ঠিকই আছে। ছন্দপতন কবে থেকে শুরু হ'ল মনে করতে পারে না। লেকের জলে প্রায় ডুবে যাওয়ার মতো। ক্লান্তিকর, অর্থহীন, গন্তব্যহীন এক পথ। মাইলস্টোন আছে কিন্তু শেষ ঠিকানা জানা নেই। যদি গতিময় ঘড়ির কাঁটাকে থামিয়ে রাখা যেত তবে এই বুকভরা ব্যথা ওকে যন্ত্রণা দিত না। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসত না। দুচোখ বেয়ে উত্তাল ঝর্ণা নামত না।

মনে পড়ে, প্রথমবার গরমের একটা এক্সটেন্ডেড উইকএন্ডে বাফেলো হয়ে নায়াগ্রায় গিয়েছিল দুজনে। ড্রাইভ করেছিল ওদের নিসান প্যাথফাইন্ডার। নায়াগ্রার মেড অফ দ্য মিস্ট আর ভয়াল কেভ অফ দ্য উইন্ডস দেখে প্রথমে একটু ভয়ই পেয়েছিল মণিদীপা। তারপর এক উদ্দাম আপস্ট্রীম রিভার ক্রুজে গিয়ে ঢেউয়ের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। অপরূপ নায়াগ্রাকে আপন করে নিয়েছিল। তারপর আরো কতবারই তো গেছে। ওখানে গেলেই মন হালকা হয়ে যায়।

সেবার নায়াগ্রা থেকে ফেরার পথে ওরা একদিনের জন্য লেক স্ক্রুনে গিয়েছিল। আশ্চর্য, অতটা ড্রাইভিং-এর পর সমান তালে হাইকিং করেও একটুও ক্লান্তি আসেনি। বরং ফিরতেই ইচ্ছে করছিল না। আপস্টেট নিউ ইয়র্ক ওকে এখনো খুব টানে। প্রেমের এক নিবিড় বন্ধন তৈরি হয়ে গেছে।

৩

ডক্টর জোসেফ মিসলিনস্কি প্যানিক অ্যাট্যাক এবং সিভিয়ার anxiety থেকে অবসাদ বলেই চিকিৎসা করছেন। অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট খেতে হয় মণিদীপাকে। কতদিন ধরে খাচ্ছে মনে পড়ে না। আজকাল অনেক কিছুই মনে পড়ে না, কতকিছু ভুল হয়ে যায়। আবার কতকিছু ভুলতেই পারে না। কে জানে হয়তো কিছু ভুলে যাওয়াতেই এক রকমের শান্তি আছে। পার্শিয়াল অ্যামনিশিয়া বোধহয় একরকমের স্বস্তি আনে। কিন্তু নায়াগ্রা ব্যতিক্রম। ও কিছুতেই ভুলতে পারে না ওই জলপ্রপাতের তুমুল উচ্ছ্বাস যা চেপে বসে থাকা পাথরটাকে একটু আলগা করে দিয়ে বলে – এসো, হাত ধরে কিছুটা পথ একসাথে চলি। আমি আছি, থাকবও।

মণিদীপার থেরাপিস্ট ডক্টর মার্টিনা ওয়াইস বলেন, "ট্রমা থেকে বেরিয়ে আসার একটা উপায় হচ্ছে দর্শকের মতো বাইরে থেকে স্মৃতিদের দেখেও রেস্পন্ড না করে ওদের চলে যেতে দেওয়া। প্রতি মুহূর্তের সাথে ভেসে যাও। মুহূর্তগুলোকে অ্যাক্সেপ্ট করে বুঝে নাও 'ডীপা', পরিবর্তন ঘটছে প্রতিনিয়ত। মেলে দাও নিজেকে এই অনুভূতির কাছে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নাও। ক্ষমা করো নিজেকে, সবাইকে, সবকিছুকে। জানি সহজ নয়, কিন্তু আমাদের যে অন্য পথ নেই। পুরনোকে না ধরে রাখলে অতীত কখনোই নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে পারে না। ইউ হ্যাভ টু লেট দেম গো। কমপ্যাশন বৃষ্টি হয়ে ঝরুক মনের গভীরে। ভিজে যেতে দাও সর্বাঙ্গ।"

চেষ্টা করে মণিদীপা। কিন্ত অনেককিছু যে ভুলতে পারে না। জমাট বাঁধা অন্ধকারে তলিয়ে যায়, ডুবে যায়, হাত বাড়ায়, আর তখনই ডক্টর ওয়াইস খুব যত্নে, পরম স্নেহে ওর হাত ধরে উঠে বসিয়ে দেন। সেশন শেষ হলে জিজ্ঞেস করেন, "এখন কেমন ফীল করছ, ডীপা?"

অনেক চেষ্টা করেও উনি কিছুতেই ওকে 'দীপা' বলতে পারেন না। হার্ড হিটিং জার্মানিক কনসোনেন্টে জিভ অভ্যস্ত হয়ে গেছে; তাই হয়তো পারেন না। মণিদীপার কিন্তু এই 'ডীপা' ডাকটা খুব নিবিড়, খুব আপন মনে হয়।

- "আমার খুব ক্লান্ত লাগছে মার্টিনা। ভীষণ অবসন্ন লাগছে।"

- "এরকম হয়, খুব স্বাভাবিক। তুমি ভাল আছ, ডীপা। বিশ্বাস করো, তুমি ভাল আছ। একবার ঘুরে এসো নিউ ইয়র্কের স্টোনি

পয়েন্ট Zen Retreat Center-এ। নিজেকে খুঁজে পেতে সুবিধে হবে; তোমার ইনটার্নাল ডায়লগ শুনতে পাবে। সে এক সম্পূর্ণ আলাদা অনুভূতি।”

মণিদীপা বিশ্বাস করতে চায় ও ভাল আছে। ছোটবেলায় ওর ঠাকুমা বলতেন “বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।” কতবার শুনেছে মা’র মুখে “ফেইথ মুভস মাউনটেইন্স।” আবার যদি ওই বিশ্বাসটা ফিরে পেত! কিন্তু কোথায় যেন ভিত নড়ে গিয়ে সব ফ্লুইড হয়ে গেছে। ধরতে গেলে পিছলে পালিয়ে যায়। রঙ পালটায়, ফর্ম পালটায়, নতুন ইন্দ্রজাল তৈরি হয় অরোরার মতো, যেমনটি দেখেছিল আইসল্যান্ডে। পারলানে মাথার ওপর আকাশে অবিশ্বাস্য নর্দার্ন লাইটের আত্মহারা নৃত্য। অভূতপূর্ব আসমানি kaleidoscope; ঠিক যেন ছোটবেলায় দোল খেলার মতো। আকাশেরও হয়তো ইচ্ছে হয় আবীর খেলতে, রঙ মেখে সবাইকে চমকে দিতে।

৪

হেমন্তের বৃষ্টি হয়েই চলেছে একনাগাড়ে। বৃষ্টির একঘেয়ে চাপা কান্না রাতের অন্ধকারে গুমরে গুমরে মণিদীপার বুকে ধাক্কা মারছে। ঘুম আসছে না। ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নের ভীড়ে চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে, খুলতে কষ্ট হচ্ছে। কে যেন সিঁড়ি ওঠানামা করছে। সাদা দেয়ালে ছায়ামূর্তির নানা প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে। ভয়ে হাত-পা কাঁপছে। মনের ভুল, নাকি স্বপ্ন; নাকি সত্যি? ও উঠে বসল বিছানায়। ঘড়িতে ৩:৩০। ফুটবেডের বেঞ্চের ওপর ছড়ানো লাল হুডিটা নাইট ড্রেসের ওপর চাপিয়ে নিল। শিরশির করে উঠল সারা শরীর। অভ্যেসবশত নাইটস্ট্যান্ড থেকে সেলফোনটা পাজামার পকেটে ঢোকাল। আলো জ্বেলে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। কেউ নেই। নীচে গেল। লিভিংরুম, ফ্যামিলিরুম, ডাইনিংরুম, কিচেন সব অন্ধকারের কালো চাদরে ঢাকা।

হঠাৎ একটা চিৎকার সব কালো নিস্তব্ধতাকে কাঁচের মতো টুকরো টুকরো করে দিল। প্যাটিওর স্লাইডিং দরজা হাট করে খোলা। ভেজা ডেকের ওপর ফ্ল্যাশলাইট হাতে ধীমান চিৎকার করে যাচ্ছে। ভিজে চুল লেপটে আছে কপালে। খালি পা, পাজামাও ভেজা। শুধুমাত্র নীল টি-শার্ট গায়ে। বৃষ্টির ছাট ওর চোখের উন্মাদনাকে আরো তীব্র করে তুলেছে। কোনো সাড় নেই আর।

বিদ্যুৎ ছুঁয়ে গেল মণিদীপার মাথায়, মনে, সারা শরীরে। এক অন্য অলটার্ড মেন্টাল স্টেট দেখছে যেন, এক অন্য ধীমানকে প্রত্যক্ষ করছে। কিছুক্ষণ থমকে গিয়ে, পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল।

- “কী করছিস এখানে ধী? চল ভেতরে চল, ঠান্ডা লেগে যাবে। অনেক রাত এখন। শুতে চল। খারাপ স্বপ্ন দেখেছিস?”

- “না, স্বপ্ন নয় মণি। সত্যি দেখেছি আমি। পরিষ্কার দেখলাম বাবাকে।”

- “কী! আচ্ছা, ঠিক আছে। সকালে কথা বলব। এখন চল ধী। ঘুম না হলে ওরম হয়।”

- “না না, বাবাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে আমাকে। জঙ্গলের পেছনের ওই লেকের জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন আমায় ফেলে। দুটো হরিণ সাথে ছিল। জ্বলজ্বলে চারটে চোখ বাবার পেছন পেছন যেতে বলল আমায়। ওরা পথ দেখিয়ে দেবে আমি জানি।”

- “কী যা-তা বলছিস ধী! বাবা নেই, কী করে আসবেন এখানে? উনি চলে গেছেন চিরকালের মতো। তুই শেষ কাজ করেছিলি লাটাগুড়িতে। মনে নেই তোর? আজ ছ’বছর হতে চলল। আর জলের ওপর কি হাঁটা যায় নাকি? তাছাড়া তুই যাবিই বা কী করে? এখন এই রাতের অন্ধকারে হরিণকে ফলো করে ইন্টারস্টেট হাইওয়ে পেরিয়ে জঙ্গলের লেকে যাবি তুই বাবাকে ফিরিয়ে আনতে? তুই কি নিজে শুনতে পাচ্ছিস কী বলছিস আমায়? ক্রেজি! চল, ভেতরে চল প্লিজ। প্লিজ ধী, প্লিজ!

- “আমাকে যেতেই হবে মণি। ক্ষমা চাইতে হবে, সে জন্যেই তো বাবা এসেছেন আমাকে একটা সুযোগ দিতে। কতদিন ধরে অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে। আমি যে বাবাকে মেরে ফেলেছি মণি। কিন্তু ওটা তো একটা অ্যাকসিডেন্ট ছিল। আমি কোনো ক্ষতি করতে চাইনি মণি, বিশ্বাস কর। কিন্তু বাবা তো আমায় সেটা বলার সুযোগই দেননি। এবার বলতেই হবে। এখনো চুপ করে থাকলে, আমাকে ‘খুনী’ পরিচয় নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। আমি আর পারছি না মণি, একেবারে না, সত্যি বলছি। তুই না বুঝলে আর কে বুঝবে বল?”

মণিদীপার হাত ছাড়িয়ে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ওকে ডেকের শক্ত কাঠের উপর ফেলে দিয়েছিল ধীমান। লেকের হাতছানি ওকে নিশির মতো ডেকেছিল। ধীমান ছুটে গিয়েছিল ইন্টারস্টেট

হাইওয়ের উদ্দেশ্যে। তার পরেই জঙ্গল, লেক।

এর বেশি কিছুই মনে পড়ে না মণিদীপার। একটা তীব্র আর্তনাদ এবং তারপর সব শান্ত। ভয়ংকর শান্ত। কালো রাতের গভীরে তলিয়ে গিয়েছিল ধীমান। ডেকের ওপর রক্তে ভেজা মণিদীপা বুকফাটা কান্নায়, সব হারানোর ব্যর্থতায়, বেদনায়, কুঁকড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল। প্রথমবার দু'মাসের মাথায় হয়েছিল মিসক্যারেজ। আর এবার... সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কখন যে 911 কল করেছিল, এখন আর মনে পড়ে না। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে জানতে পেরেছিল ইন্টারস্টেট ৯৩ ধীমানকে গিলে ফেলেছিল। জীবনে ক্লোজার না পেলে হয়তো ক্ষতের ওপর মলম খুব একটা কাজ করে না। শুকোতেই চায় না চোট।

৫

- "সেই রাতের ব্যাপারটা একটা অ্যাকিউট সাইকটিক ব্রেক। এক্ষেত্রে হ্যাল্যুসিনেশন। ধীমানের এক ধরনের বিভ্রান্তিকর মানসিক অবস্থা তখন। কমপ্লীটলি ডিল্যুশনাল। ডীপা, তোমায় বুঝতে হবে বাবাকে মেরে ফেলার ব্যাপার আমাদের জানার বাইরে; আসল ব্যাপার যে কী, তা জানা অসম্ভব। সাইকো-থেরাপির মাধ্যমে বোঝা যেত কিন্তু সেটার তো আর অবকাশ নেই। অনেক কিছুই আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু এভাবে পেছনে তাকালে কি হাঁটা যায়? তোমার ভাল থাকাটাই আসল, ডীপা। আমাদের ফোকাস সেটাই।"

অপলক তাকিয়ে থাকে মণিদীপা ডক্টর ওয়াইসের স্নিগ্ধ চোখের দিকে। করুণাধারা ঝরে অবিরাম মার্টিনার শান্ত চোখে। মা'র ছবি ভেসে ওঠে ক্যানভাসে।

মণিদীপা কোনদিনই জানতে পারবে না ধীমান কেন বাবাকে মেরে ফেলার কথা বলেছিল? কী ঘটেছিল আসলে? নাকি সবটাই ডিল্যুশন? অপরাধবোধ? কিসের জন্যে? মেরে ফেলা কি একটা মেটাফোর? কী বোঝাতে চেয়েছিল ধীমান? মণিদীপা কি রেড ফ্ল্যাগগুলো চিনতে পারেনি? নাকি চিনেও অবহেলা করেছে? ভেবেছে সাময়িক খামখেয়ালিপানা। ঠিক হয়ে যাবে সময়ের সাথে?

বিয়ের এক বছর আগে থ্যাংক্সগিভিংয়ে ক'টা দিন কেমব্রিজে ধীমানের সঙ্গে কাটাতে এসেছিল মণিদীপা। ও নিজে তখনও থাকে ভার্জিনিয়ায়। কেনডল স্কোয়ারের স্টারবাক্সে কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়ে গোটানো শার্টের হাতার তলায় চোখে পড়েছিল ধীমনের বাঁহাতের কব্জিতে অসংখ্য লম্বা কাটা দাগ। ব্লেড দিয়ে চেরা। জিজ্ঞেস করতে বলেছিল, "ও কিছু না রে। মনে নেই তোর, খড়্গপুরে ছেলেদের হস্টেলে একবার বিতর্ক হয়েছিল যে আমাদের মধ্যে কে মতাদর্শের জন্য যীশু হতে পারে? গত মাসে মনে পড়ল হঠাৎ। তাই ভাবলাম যীশুর কষ্টটা একটুখানি বুঝতে পারি কিনা দেখি।"

- "তুই কি পাগল ধী? কেউ এইভাবে ব্লেড দিয়ে নিজের হাত কাটাছেঁড়া করে? ভাবতে পারছি না আমি। এত ডেসপারেট কেন তুই? এত বেপরোয়া!"

- "ধুর, কেটেও তো বুঝতে পারলাম না যীশুর যন্ত্রণা।"

- "কী প্রমাণ করতে চাস তুই ধী? কী খুঁজে বেড়াস মাথার মধ্যে?"

- "আরে, সেটাই তো বুঝতে পারি না। বুঝতে পারলে তো হাঁটা শেষ।"

মনে আছে রাতে পাশাপাশি শুয়েও বহু দূরে চলে গিয়েছিল ধীমান; ওদের সেই লাটাগুড়ির টিনের চালের বাড়িটায়। বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে ভাবলে। কত সহজেই সীমানা ও দূরত্ব অতিক্রম করতে পারত ধীমান! ফিজিক্যালিটির কোনো গুরুত্বই ছিল না ওর কাছে। মনভূমিতে সর্বত্র অবাধ গতিবিধি। অথচ মণিদীপাকে কাছে না পেলে খুব বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত।

রেড ফ্ল্যাগগুলোকে অ্যাড্রেস করলে কী হতো? মণিদীপা কি সেল্ফ হার্ম থেকে বাঁচাতে পারত ধীমানকে? মানসিক সুস্থতা আর বিকৃতির মধ্যের সরু রেখাটা এত সূক্ষ্ম যে বোঝাই যায় না ক্রসওভারের সঠিক মুহূর্ত। মণিদীপা কি বুঝেছিল ওর অজাত শিশুর ঘাতক একটা অপূর্ব সম্ভাবনাকে জেনেশুনে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছিল। দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছিল? যথেষ্ট মানসিক প্রস্তুতি ছিল না? নাকি পুরো ব্যাপারটা শুধুই একটা মর্মান্তিক অ্যাকসিডেন্ট মাত্র? ওর আর ধীমানের জীবনে বারবার এত দুর্ঘটনা ঘটেই বা কেন এমনভাবে?

"There are infinite possibilities, Deepa, in front of you. You need to accept the now and then let go of the yesterday that caused you the pain. You need to practice self-love. নিজেকে আবার আগের মতো ভালবাসো, দেখবে পৃথিবী সেই ভালবাসা তোমায় হাজার গুনে ফিরিয়ে দিচ্ছে।"

মার্টিনা ওয়াইস Zen মনোভাবাপন্ন। উনি মাইন্ডফুল মেডিটেশন আর গেস্টাল্ট থেরাপির মাধ্যমে উৎসাহ দেন মণিদীপার মতো মানুষদের, যাতে তারা জীবনে কমপ্যাশন ফিরিয়ে আনতে পারেন। ডক্টর ওয়াইসের শব্দসমুদ্রের ঢেউ মণিদীপাকে চুম্বকের মতো টানে। ও ভেসে যেতে চায় অনেক দূরে। লাইটহাউস দেখতে পায় নিজের আয়নায়। ছুঁতে ইচ্ছে করে ওই চূড়ো।

মণিদীপা বিশ্বাস করতে চায় অনেক সম্ভাবনার কথা। ওর অপূর্ণ স্বপ্নের কথা। কিছুটা ক্যাথারসিসে যেমন এক ধরনের স্টোইসিজিম বা স্থিতপ্রজ্ঞতা আসে, ঠিক তেমন অবস্থায় যুগ যুগ ধরে বাস করতে চায়। বিন্দু বিন্দু ভয়, ভাবনা, ব্যথা, কষ্ট তখন সব ইথারে মিলিয়ে যায়, কোনও তলানি পড়ে থাকে না। লেফ্ট ওভার রেসিড্যু থাকে না ওই মেন্টাল স্টেটে। নির্বাণ!

৬

- "আমাদের মন একটা ক্যামেরা রে, দীপু। কত ছবি সারাক্ষণ ধরা থাকে ওখানে, টেরই পাই না আমরা। মনে আছে তোর দীপু, এমটেক ফাইনালের পর তপু, তুই, ধীমান, বিজু, দেবজানি, রাতুল, রিতালি, আমি সবাই মিলে জলদাপাড়ার ট্রি-হাউসে তিন রাত্তির একসাথে কাটিয়েছিলাম?"

- "ওই দিনগুলো খোলা আকাশ ছিল রে। কখনো ভুলতে পারব না। কানপুর থেকে ধী এল আমাদের সাথে যাবে বলে। খড়্গাপুরের পুরনো গল্পের ভান্ডার খুলে বসল। ওর নাকি আমাদের ছাড়া কানপুর একদম ভালই লাগে না। শেষে আমরা ফিরলাম কলকাতায় আর ও ফিরল লাটাগুড়িতে। পরের বছর যে যেখানেই থাকুক না কেন ঠিক একই সময় দেখা হবার কথা ছিল গরুমারায়। সেটা তো আর হ'ল না!"

- "আমাদের কথা বলতে পারব না, কিন্তু তোকে ছাড়া যে ধীমান কিছুটা দেবদাস সে আমরা খুব ভালই বুঝতাম।" তপু হেসে জড়িয়ে ধরল মণিদীপাকে।

- "আহা, কি বোকা বোকা সব ইমেইল পাঠাত আমায়। মোস্ট আনলাইক দ্য ব্রিলায়ান্টলি সেরিব্রাল ধীমান।"

- "প্রেমে পড়লে দ্য বেস্ট মাইন্ডস সাউন্ড হোপলেসলি বোকা বোকা। ওটাকে লাভ হর্মোন, লাভ কেমিকাল, যা বলিস – অক্সিটোসিনের কামাল রে! সব তখন মজনু।" বাপ্পার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হেসে ফেলল তপু। "আর ধীমানের তো প্রেমে হাবুডুবু হাল।"

- "হুম! আমরাই শুধু মজনু, আর তোরা বুঝি লায়লা ছিলি না! এই, তোদের মনে আছে দ্বিতীয় দিন সকাল থেকে আকণ্ঠ টোংগবা গিলে কেমন নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ধীমান? যদিও দেখিনি কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস অ্যালকহলের সাথে মিক্স করেছিল ক্যানাবিস বা লোকাল কিছু। হাতীর পিঠে চড়ে গন্ডার দেখা মাথায় উঠল আমাদের। সারাদিন তন্ন তন্ন করে খুঁজে সন্ধ্যের অন্ধকারে যখন আমরা হাল ছাড়তে বসেছি, ও তখন রক্তবর্ণ চোখে টলতে টলতে ফিরে শিশুগাছের নিচে একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে গেল। অল্প দূরে এক আদিবাসী টোটো তরুণী মিটিমিটি হাসছে। ওরই কাঁধে ভর করে ফিরেছিল ধীমান।"

- "মনে আছে সব।" চোখ মুছল মণিদীপা।

- "কোনদিন বলল না কোথায় ছিল সারাদিন। কী করেছিল। একটু সুস্থ হতেই বলল, 'তোরা কেউ বাবার সামনে এই নীলকণ্ঠ হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কোনদিন ভুলেও কথা তুলবি না। বোম ভোলেনাথ যতই গাঁজা ফুঁকুন না কেন, বা মারিওয়ানা যেখানে যতই পাওয়া যাক না কেন, বাবার কাছে আমার নো ক্ষমা। তোরা বিট্রে করলে আমার এমআইটিতে যাওয়া বানচাল হয়ে যাবে কিন্তু। কথা দিচ্ছিস তো তোরা?' বলেই হো হো করে হাসতে লাগল।"

- "মনে আছে বলেই তো এত যন্ত্রণা রে। এমন ব্রিলিয়ান্ট একটা ব্রেইন, কিন্তু কী হ'ল বল? এত কন্ট্রাডিকশন! এত কমপ্লেক্স! এত কিছুর সমন্বয়! তোরা জানিস কিনা জানি না, একবার ওর বাবার কোন কথায় ওপিঅয়েড ওভারডোজ করে প্রায় যায় যায় অবস্থা। ইএমটি এসে বাঁচিয়েছিল। অক্সিকোডোন! ভাব! সদ্য তখন ও এমআইটিতে নিউক্লিয়ার এঞ্জিনিয়ারিং-এ টিচিং অ্যাসিসটেন্টশিপ পেয়েছে। কেমব্রিজে ওর অ্যাপার্টমেন্টের হাউসমেট 911 কল করেছিল। আমি তো তখন ভার্জিনিয়া টেক-এ পিএইচডি নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু আজ অবধি জানি না কী বলেছিলেন উনি যাতে ধী অমনভাবে ট্রিগার্ড হয়েছিল সেদিন।"

মণিদীপার বিষণ্ন রুটিনে বাপ্পা আর তপু যেন একরাশ রজনীগন্ধার স্নিগ্ধতা। গত বছর একটা প্রজেক্টের কাজ নিয়ে রচেস্টারে এসেছে ওরা। মনে হয় থাকবে বেশ কিছুটা সময় নিউ ইয়র্কে। তারপর তো নিশ্চয়ই সেই চিরাচরিত গ্রীন কার্ডের যাত্রা শুরু হবে ওদের। সারাক্ষণ ওকে কীভাবে আগলে রাখবে, সেই

ভেবেই দুজন অস্থির, যতই দূরত্ব থাক না কেন রচেস্টার, নিউ ইয়র্ক আর উইনচেস্টার, ম্যাসাচুসেটসের মধ্যে | মণিদীপার ভাবতে ভাল লাগে, স্কুল কলেজের বন্ধুরা এমনই হয়!

ওদের ছোট্ট মেয়ে তিতিরও খুব ভক্ত এই নতুন মাসীর | দেখা হলেই গুছিয়ে কোলে বসে স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে অনর্গল আজগুবি গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলেই চলবে | তখন তাকে মাসীর কোল থেকে কিছুতেই নামানো যবে না | মাসী না খাইয়ে দিলে খাবার টেবিলের চারপাশে ছুটোছুটি করবে, আর নানা দুষ্টুমি করে তপুকে বিরক্ত করে ছাড়বে | খিলখিল করে হেসে বলবে, "আমি তো তিতির পাখি | ডানা দিয়ে উড়ব | ধরতে পারবে না কেউ | শুধু মনুমাসী বললে, ঝপাং করে কোলে বসে পড়ব |"

মণিদীপা ওকে জড়িয়ে ধরে ভাবে, ইশ, সারাদিনের কাজের পর বাড়ি ফিরে যদি ওর গলা জড়িয়ে নানা বায়না করত তিতির, আদরে ভরিয়ে দিত ওর নির্জন দিনরাত, তাহলে ওর হয়তো আর থেরাপির প্রয়োজন হতো না | কিন্তু অনেকটাই দূর যে উইনচেস্টার থেকে রচেস্টার!

৭

নিউ ইয়র্ক রকল্যান্ড কাউন্টির স্টোনি পয়েন্ট Zen Retreat Center-এ শুধুমাত্র মণিদীপার জন্যেই এসেছে বাপ্পা আর তপু | তিতিরকে রেখে এসেছে তপুর মামাতো দিদির কাছে অলবানিতে | ছোট বাচ্চাকে নিয়ে মাইন্ডফুল মেডিটেশন অসম্ভব | তিতির অবশ্য একটুও রাজি ছিল না | খ্রীস্টমাসের ছুটিতে ডিজনি ওয়ার্ল্ডে না নিয়ে গেলে ও রাজিই হবে না থাকতে রুবিমাসীর কাছে অলবানিতে | ওটাই ডীল | একরত্তি মেয়ে, কিন্তু আমেরিকার দৈনন্দিন যাপনের ভাষা রপ্ত করে ফেলেছে | তাই ডিজনি ওয়ার্ল্ডে নিয়ে যাবে বলে গড প্রমিস করতেই হয়েছে বাপ্পাকে | ভাবলেই হাসি পায় মণিদীপার | ছোটরা আজকাল খুব স্মার্ট | তুলনাই হয় না ওর ছোটবেলার সাথে | নতুন কিছু করতে বললেই মার আঁচলে মুখ লুকাত মণিদীপা | আর তিতির বাবার সাথে ডীল করে "ডান" বলে হাই ফাইভ করতে ব্যস্ত! বিজয়িনী যে!

- "দেখ, কোথাও না কোথাও পুরনোরা সব সযত্নে লুকানো থাকে রে | চোখ বন্ধ করলেই সব ভেসে ওঠে | চেষ্টা করেও মুছে ফেলা যায় না সব | বিয়োগ হয় না, শুধু যোগ করতে পারি আমরা |"

- "ঠিক বলেছিস তপু | কী অদ্ভুত সেক্সটিলিয়ান ক্যাপাসিটি ডেটাবেস নিয়ে ঘুরে বেড়াই সর্বক্ষণ আমরা নিজেদের অজান্তে! হঠাৎ ধরা দেয় ওরা, ধরা পড়ে যাই আমরাও | তাই না, বল?"

- "চলে আয় না কিছু যোগাড় করে রচেস্টারে | কী হবে একা থেকে তোর উইনচেস্টারের বিশাল বাড়ীতে? একটা কাজ ঠিক পেয়ে যাবি দেখিস, জানি আমি | আর তোর তো আপস্টেট খুব প্রিয় | সবাই একসাথে থাকলে এত দুশ্চিন্তা হবে না আমাদের | তিতির তো আহ্লাদে আটখানা হবে |"

মণিদীপা শোনে তপুর কথা | মনে মনে স্বপ্নও দেখে সেই আগের মতো সবাই একসাথে | ভাবে এবার ফিরে গিয়ে বেশকিছু ছবি ডিলিট করতে হবে | ডেটাবেসে স্পেস তৈরি করতে হবে | যাতে নতুনকে জায়গা দেওয়া যায় | পর্দা সরিয়ে দুচোখ ভরে দিগন্ত দেখতে হবে | কতদিন পর ভোরের আলো দেখল ও | স্টোনি পয়েন্টের সূর্যোদয় সত্যিই অপরূপ | সূর্যাস্তও মন ছুঁয়ে যায় | অসম্ভব ভাল এখানের ইমার্সিভ সাউন্ড বাথ মেডিটেশন এবং ফরেস্ট বেদিং প্র্যাক্টিস | মার্টিনার প্রতি আবেগে ভরে যায় মনটা | ও না বললে, হয়তো আসাই হতো না | নতুন করে হাডসনের প্রেমেও পড়া হতো না মণিদীপার |

মণিদীপার বুকে আবার অঝোরে বৃষ্টি নামে | অসীম প্রেমের বৃষ্টি যাকে কোনো বেড়া দিয়ে আটকানো যায় না | বৃষ্টি শেষে স্লেট রঙের গোমড়া মেঘ সরে গিয়ে ঝলমলে আলোয় ভেসে যায় আকাশ মাটি | সদ্যস্নাত পৃথিবী নতুন সাজে সেজে ওঠে | কী অপরিসীম সুন্দর দেখায় তখন তাকে! মণিদীপার মন ডুবে যেতে চায় ওই অনন্ত সৌন্দর্যে |

এক কল্পনা-বিলাস

আশীষ দত্ত রায়

শুনেছি, বরিশালের মেঘনা তীরবর্তী উত্তর শাহবাজপুরেই আমাদের পিতৃপুরুষের আদি ভিটে। শৈশবে ঠাকুরমা, জ্যাঠা, বাবা এবং তাঁদের কাকাদের কাছে শুনেছি তার খণ্ড খণ্ড গাঁথা – স্মৃতির সুধায় স্নাত এক হারানো জগতের মায়াবী আখ্যান।

সেই সুপারি-বাগান, নারিকেল-বাগান, ঋতুচক্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা রসালো ও শুকনো ফলের সমারোহ – গ্রীষ্ম, বর্ষা কিংবা শীতের আদরে যে ভূমি আপন স্বাভাবিক ঐশ্বর্যে ভরে উঠত। বাবা, জ্যাঠারা তখন নিতান্তই কিশোর – গাছে চড়ে লুকিয়ে ফল পাড়ার দুরন্ত কাণ্ডকীর্তির গল্প তাঁরা হাসিমুখেই বলতেন।

আমরা সে কৈশোর পাইনি। আমাদের শৈশব-কৈশোরের বিস্তার ছিল ইঁট-কাঠের বদ্ধ নগর কলকাতায়। সেখানে ফলের গাছ তো সুদূরপরাহত, ফুলগাছেরও ছিল দুর্লভ উপস্থিতি। হাতে গোনা কয়েকটি বাড়িতে শৌখিন ফুলগাছ আর গুটিকয়েক আমগাছের অস্তিত্ব ছিল মাত্র।

আজ সে পিতৃভূমি শুধুই স্মৃতির অলিন্দে উজ্জ্বল হয়ে আছে। পড়ন্ত বিকেলের নিস্তরঙ্গ নীলিমায়, একাকী অবসরের নিস্তব্ধ মুহূর্তে, কখনো কখনো হৃদয়ের গহীনে সেসব গল্প বেজে ওঠে। তখন এক গভীর আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয় – ফিরে যাই একবার সেই পুরনো ভিটেয়, যেখানে আমার পিতৃপুরুষেরা জন্মেছিলেন, শৈশব কাটিয়েছিলেন, জীবনের আনন্দ-বেদনার সুর বুনেছিলেন। সেই ভূমির মাটিতে তাঁদের চরণধূলি লেগেছে, বাতাসে মিশে আছে তাঁদের দীর্ঘশ্বাসের গোপন গুঞ্জন।

দেশভাগের ক্ষত আমার দাদু কখনোই মেনে নিতে পারেননি। এপার বাংলায় এসে দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিধান রায়ের পরিকল্পিত এক শিল্পনগরীর কংক্রিটের আবাসে তাঁর জীবনের অন্তিম দিনগুলি কেটেছে – সে একান্ত যান্ত্রিক পরিবেশ, প্রিয় প্রকৃতির স্পর্শহীন কঠিন বাস্তবতা, যা তাঁকে ক্রমে গৃহহীনতার যন্ত্রণায় নিঃশেষ করে দিয়েছিল। সেই দুর্দিনে হারিয়েছিলেন তিনি তাঁর পরম স্নেহের জ্যেষ্ঠ কন্যাকেও। কিন্তু সব শোকের ঊর্ধ্বে ছিল তাঁর একান্ত আপন ভিটে-মাটির বিরহ। শেষ দশটি বছর সেই ব্যথাই তাঁকে নীরবে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। আমার সাথে তাঁর দেখা হয়নি। আমার জন্মের আগেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

বাবা, জ্যাঠা, পিসি তাঁদের হারানো ভিটে-মাটির শোককে অবদমন করে অস্তিত্বসংগ্রামে নিবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের সেই লড়াই আমাদের শৈশব-কৈশোরের রূঢ় বাস্তবতাকে খানিকটা প্রশমিত করেছিল। আমি বড় হয়েছি নিজের বোনেদের পাশাপাশি জ্যাঠতুতো ও পিসতুতো ভাইবোনদের সাহচর্যে। সে ছিল সত্তরের দশকের শেষাংশ – একাত্তর ও বাহাত্তরের অশান্ত কলকাতা, যেখানে একদিকে নকশাল আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বামপন্থী ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে তাদের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ভয়াল দাপট।

কিন্তু আমার জীবন সম্পূর্ণ পাল্টে গেল আঠারো বছর বয়সে – সে এক অন্য অধ্যায়, অন্য এক আখ্যান।

আজ, বুড়ো হওয়ার আব্দারে সেই সুপ্ত বাসনা জেগে উঠছে – সুযোগ পেলেই একবার ফিরে যাব সেই পিতৃভূমিতে (যা একইসঙ্গে মাতৃভূমিও)। একবার ছুঁয়ে দেখব সেই প্রাচীন ভিটের মাটি, যেখানে আমার পূর্বপুরুষদের পদধূলি পড়েছে। যেখানে তাঁদের প্রাণের শ্বাস-প্রশ্বাস মিশে আছে বাতাসে। কল্পনায় দাদু, জ্যাঠা কিংবা বাবার হাত ধরে ঘুরে বেড়াব সুপারি, নারিকেল, আম, কাঁঠাল গাছে ছাওয়া ছায়াময় পথ ধরে।

যদি বাস্তবেই যাওয়ার সুযোগ আসে, থাকুক না তখন পাপু বা দেবর্পিতার হাতধরা সেই যাত্রায়। হয়তো তারাই খুঁজে দেখিয়ে দেবে আমার স্বপ্নের সেই হারানো ঠিকানা – যা ইতিহাসের পাতায় নয়, হৃদয়ের অন্তঃপুরে চিরসজীব হয়ে রয়েছে।

কাছে দূরে

সুজয় দত্ত

- **"নাঃ,** আপনি একজন সত্যিকারের গুণী মানুষ। উই আর রিয়েলি লাকি টু ওয়ার্ক উইথ ইউ –"

- "হঠাৎ এ-কথা?"

- "হঠাৎ নয়, আমি তো অনেকদিন ধরেই সবাইকে বলছি – এই প্রজেক্টটা আপনি না হলে এভাবে দাঁড়াত না। শুধু ফাউন্ডেশনেই তো নয়, প্রায় প্রতিটা স্টেজে আপনি যেভাবে আমাদের আইডিয়া ম্যান ছিলেন, তাতে..."

- "কিন্তু প্রজেক্ট শুধু দাঁড়ালে কি আপনাদের চলবে? তাকে তো দৌড়োতে হবে।"

- "হেঃ হেঃ হেঃ। ও নিয়ে ভাববেন না। প্রমোশন, মার্কেটিং আর ডিস্ট্রিবিউশন – এই তিনটে জিনিসই তো একটা প্রোডাকশন উইনার না লুজার সেটা ঠিক করে। তিনটে ব্যাপারেই এমন ঘ্যামা ঘ্যামা লোক আমার পকেটে, ওগুলোতে আমাদের টেক্কা দেওয়া সোজা নয়।"

- "বলছেন?"

- "একশোবার। দেখে নেবেন আপনি, 'কাছে দূরে'র কাছাকাছিও আসতে পারবে না এবছরের অন্য কোনো রিলিজ। সবাই দূর থেকেই সেলাম করবে।"

- "বেশ। দেখাই যাক তাহলে। এই সোশ্যাল মিডিয়া আর স্ট্রিমিং ভিডিওর যুগে এরকম একটা ছবি দর্শকদের কাছে টানতে পারে কিনা।"

- "অ্যাবসোলিউটলি! নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। পরীক্ষিৎ সেনের মতো ডিরেক্টর আছে, কানাডা আর উত্তরবঙ্গে জয়েন্ট শুটিং আছে, দেবোপম-শ্রীপর্ণার মতো পপুলার রোম্যান্টিক জুটি আছে, অনুপম-অন্বেষার গোটা তিনেক মোক্ষম মোক্ষম গান আছে। আর কী চাই? ওই গানগুলো দেখবেন আলাদা করে হিট হবে। তবে সবচেয়ে বেশী কী আছে জানেন?"

- "কী?"

- "আপনার হাতের জাদু। যা একখানা গল্প ফেঁদেছেন না – এক্কেবারে যাকে বলে ইয়ে। তারপর স্ক্রীনপ্লেটাও ফাটাফাটি লিখেছেন। গানের লিরিক্সও তো আপনার কবিতার বই থেকেই অ্যাডপ্টেড। এসব ছিল বলেই তো পরীক্ষিতের মতো খুঁতখুঁতে, নাকউঁচু ডিরেক্টর – সরি, ওভাবে বলা উচিত নয় – মানে ওঁর মতো এমন চুজি, সিলেকটিভ ডিরেক্টরকেও দুবারের বেশী তিনবার সাধতে হ'ল না কাজটা নেওয়ার জন্য। যাই বলুন মশাই, উঁচুজাতের আঙুর ছাড়া ওয়ার্ল্ড ক্লাস ওয়াইন হয় না। ইটস অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট – হ্যা হ্যা হ্যা। অবিশ্যি এই মেটাফোরটা আপনার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নয় – জীবনে তো অ্যালকহল জিভেই ঠেকাননি কোনোদিন, তাই না? যাকগে, উঠি আজ। আপনারও তো আবার..."

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ান প্রীতিশ গুপ্ত। রেশমি সুতোর কাজ করা বাহারী ন্যাপকিন দিয়ে মুখটা একবার মুছে এগিয়ে এসে হ্যান্ডশেক করেন, তারপর পাশের চেয়ারে রাখা দামী কোটটা গায়ে চাপিয়ে এগিয়ে যান রিভলভিং ডোরের দিকে। ফেব্রুয়ারীর গোড়ার দিকে কলকাতায় শীত এবারে তেমন নেই, তবু ভদ্রলোক এতক্ষণ এই শীততাপনিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁয় ওই গরম কাপড়ের স্যুটটা পরেছিলেন – ভেবে ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি আসে নীলাদ্রির। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। টলিউড আর বলিউডের জাঁদরেল প্রোডিউসার যশপাল সিং রানের ডানহাত এই প্রীতিশ গুপ্ত। নিজেরও পারিবারিক মিডিয়া কম্পানি বেঙ্গালুরুতে, রমরম করে চলছে। সত্যমশিবম প্রোডাকশন্স 'কাছে দূরে'র কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে হাতে নেওয়ার পর বেশ কয়েকবার মোলাকাত হয়েছে এঁর সঙ্গে। এখন শুটিং শেষ হওয়ার মুখে, তাই চূড়ান্ত এডিটিং-এর কাজ চলতে চলতেই ছবির দেশজোড়া বিজ্ঞাপন আর বিপণনের ব্যবস্থা সব আগেভাগে করে ফেলতে হবে। অতএব নীলাদ্রি এবছর ফেব্রুয়ারীতে কলকাতার বইমেলায় আসছে শুনে প্রোডিউসারের তরফ থেকে ইস্টার্ন বাইপাসের ধারের এই বিলাসবহুল সাততারা হোটেলে ওর মধ্যাহ্নভোজের নেমন্তন্ন, আর সেই ফাঁকে ছবিটার প্রিমিয়ারের বিষয়ে কিছু জরুরী কথাবার্তা সেরে নেওয়া।

রেস্তোরাঁর আলো ঝলমলে ঘেরাটোপ থেকে বাইরে বেরিয়ে পার্কিং লটে ওর জন্য অপেক্ষমান ভাড়াগাড়িটা খুঁজতে থাকে ও। এবার গন্তব্য সল্ট লেকের সেন্ট্রাল পার্ক। বইমেলা প্রাঙ্গণের সেই পরিচিত ভীড়ে। সেখানে কলকাতার বিখ্যাত পোয়েটস্ ফাউন্ডেশনের স্টলে আরও কিছু গুণীজনের উপস্থিতিতে ওর নতুন কবিতার বই 'টুকরো রঙিন ইচ্ছেঘুড়ি'র

উদ্বোধন আজ সন্ধ্যেয়। সেইসঙ্গে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সামান্য সম্বর্ধনা। অতীতে লেখা বইগুলোও হয়তো সাজানো থাকবে অন্য সব দোকানে। বইমেলা পর্ব সেরে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারলে ভাল হয় আজ। কারণ কাল সকালেই দিল্লির উড়ান। আর তারপর দীর্ঘ যাত্রা সেখান থেকে। ফিরে যাওয়া।

কোথায় যেন ফেরা? সাততারা হোটেলের পাঁচ-কোর্স লাঞ্চের পর গাড়ির পিছনের সীটে হেলান দেওয়া নীলাদ্রির ঝিমুনি আসছিল। হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে সবকিছু কেমন গুলিয়ে যায় মুহূর্তের জন্য। কোথায় যেন বাড়ি ওর? ও হ্যাঁ, ব্র্যাম্পটন। কানাডার দক্ষিণপূর্বে বিশাল অন্টারিও হ্রদের তীরে ঝলমলে, প্রাণবন্ত শহর টরন্টো। তারই উত্তরপ্রান্তের এক শহরতলীতে ওর বাড়ি। না না, ওদের বাড়ি। হ্যাঁ, বাড়ির দলিলে, নেমপ্লেটে, গ্যাস আর ইলেক্ট্রিকের বিলে আরেকজনের নামও আছে। ড্রয়িংরুমের আসবাবপত্রে, বেডরুমের অঙ্গসজ্জায় আর রান্নাঘরের বাসনপত্রে তার অদৃশ্য হাতের ছোঁয়া। শুধু সেই মানুষটা নেই। কোথায় কখন যে সে থাকে, তার খবর আর আসে না ওর কাছে। একতরফা ইমেল আর টেক্সট মেসেজগুলো নিরুত্তরই থাকে আজকাল। কিন্তু সেই রাতটা – সেই রাতটা কি চাইলেও ভোলা যায়? বছর দুই আগে ভ্যাংকুভারে একটা তিনদিনের কনফারেন্স থেকে ফিরে সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গেছিল খালি বাড়ি দেখে, শুধু ডাইনিং টেবিলের ওপর একটা ভাঁজ করা চিঠিতে পরিচিত গোটাগোটা হাতের লেখায় একটা বার্তা – "ফাইনালি গট দি অ্যাপার্টমেন্ট ইন মিসিসগা আই হ্যাড অ্যাপ্লায়েড ফর। এনাফ রুম ফর মাই স্টুডিও অ্যান্ড লিভিং কোয়ার্টার্স, সো আই অ্যাম মুভিং দেয়ার। টেক কেয়ার। বাই।" পাগলের মতো একের পর এক ফোন করেছিল নীলাদ্রি, বারবার পাঠিয়েছিল উদ্বিগ্ন এস এম এস। উল্টোদিকে কেউ ধরেনি, কেউ পড়েনি। সেই বিনিদ্র রাতে ড্রয়িংরুমের সোফায় এপাশ ওপাশ করতে করতে কেবল কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর হাতড়াচ্ছিল ওর মন। কেন? কোন অপরাধে? কিসের শাস্তি এটা? ভোররাতে দুচোখে অবসাদের ঘুম নেমে আসার আগে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল বহু বছর আগে শোনা একটা গানের কলি, "ঠিকানা না রেখে ভালই করেছ বন্ধু। না-থাকার কোনো কারণ সাজাতে হবে না তোমায় আর...।"

ব্র্যাম্পটন থেকে মিসিসগা। কতই বা হবে – বড়জোর ৩০ কিলোমিটার। তবু দুয়ের মাঝে যেন আলোকবর্ষ। ঠিকানা যদিও বা মিলল কিছুদিন পরে স্থানীয় পোস্টঅফিসের সৌজন্যে, কাটল না নীরবতা, এল না কোনো জবাব। "আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ডিস্টার্বড ইন মাই আর্টিস্টিক পারস্যুস" আর "পাস্ট ইজ পাস্ট। আই অ্যাম নট আনসারেবল টু এনিওয়ান" – এই কটা কথায় বন্ধ হয়ে গেল যোগাযোগের সব রাস্তা। আগাগোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছে তুহিনা, কথায় কথায় ইংরেজি বলার অভ্যেসটা বিয়ের আগে থেকেই ছিল। টেক্সট মেসেজেও বাংলিশ অর্থাৎ ইংরেজি হরফে বাংলা লিখতে স্বচ্ছন্দ নয়। এই নিয়ে বিয়ের পর নববধূকে ঠাট্টা করত নীলাদ্রি; বলত, "জানো তো, কানাডায় ইংরেজি বললে লোকে বিদেশী ভাবে। বাংলা না বলতে চাইলে বরং পাঞ্জাবীটা শিখে নাও, ওখানে তো সাহেবদের চেয়েও পাঞ্জাবী বেশী।" ভাবলে অবাক লাগে, এই মেয়ের সঙ্গে একদিন ঠাট্টা-ইয়ার্কি, হাসিগল্প, খুনসুটি – সব করেছে। রাতের পর রাত জেগে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তগুলোয় শুনেছে একে অপরের কাহিনী। আর এখন?...

একটা তীব্র হর্নের শব্দে সহসা স্মৃতিজাল ছিন্ন হয় নীলাদ্রির। একটা বাচ্চা ছেলে অসতর্কভাবে রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ির একদম সামনে চলে এসেছিল, তাই ড্রাইভার জোরে ব্রেক কষেছে। গাড়ি সল্টলেকে ঢুকেছে খানিকক্ষণ আগে, এই সবে সি এ মার্কেট পেরোলো, এখনো অনেকটা পথ। সল্টলেকের এদিকটা বেশ বদলে গেছে। কাজের চাপে এমনিতেই ঘনঘন কলকাতায় আসা হয় না ওর, এবারে তো করোনা তান্ডবে আরো কয়েক বছর দেরী হ'ল। অন্যমনস্কভাবে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখে পড়ে "যুগল" লেখা বিরাট সাইনবোর্ডটা। আরেঃ, এ-বাড়িটা চারতলা হল কবে? রং বদলেছে, জাফরীকাটা পাঁচিল আর সুদৃশ্য লোহার গেটটাও আগে ছিল বলে মনে পড়ছে না। সে অবশ্য এগারো বছর আগের কথা। ১১ই নভেম্বর, ২০১১। এগারোর ছড়াছড়ি। সেদিন এই নতুন হওয়া কচি কলাপাতা রঙের দোতলা বাড়িরই একটা বড় হলঘরে আলো ঝলমলে সুগন্ধী আসরে প্রচুর হইহল্লার মধ্যে বরবেশে দাঁড়িয়ে থাকা নীলাদ্রি রায়কে ঘিরে সাতবার পাক খেয়েছিল নিউটাউনের তুহিনা সেন। সুন্দরী, স্মার্ট, সেন্ট অ্যাগনেস, লেডি ব্রেবোর্ন, যাদবপুর। জিওলজির স্নাতকোত্তর।

তার সঙ্গে আবার ভারতনাট্যম আর তনুশ্রী শঙ্করের কাছে শেখা কনটেম্পোরারি | আর নীলাদ্রি নিজে? কানাডার সবচেয়ে বড় টেলিকম কম্পানি রজার্সের প্রযুক্তিবিভাগে সদ্য প্রমোশন পাওয়া এক ঝকঝকে যুবক – যাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখা যায়, যাকে জড়িয়ে শূন্যে ডানা মেলা যায় | নতুন শতাব্দীর শুরুতে দুর্গাপুরের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইলেক্ট্রনিক্স-টেলিকম ডিগ্রী শেষ করে কলকাতার সেক্টর ফাইভে চাকরি পাওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই কম্পানির কাজে কানাডা যাওয়ার সুযোগ আসে| তারপর ছ'বছর ধরে কানাডার বিভিন্ন রাজ্যে চাকরি বদল করে অবশেষে টরোন্টোয় রজার্সে এসে থিতু হওয়া | আর সেখানে দুবছর কাটতে না কাটতেই প্রমোশন | সুতরাং বিয়ের জন্য যে কলকাতার বাড়ি থেকে তাগাদা আসতে শুরু করবে, এ আর আশ্চর্য কী? কলেজ-জীবনে যাদের সঙ্গে একটু আধটু মন দেওয়া-নেওয়া ছিল, তারা তখন জীবনস্রোতে কোথায় হারিয়ে গেছে | তুহিনা এসেছিল খবরের কাগজের ম্যাট্রিমোনিয়াল কলাম থেকে | ২০১১-র গোড়ায় কলকাতায় এসে আলাপ করার পর বিদেশে বসে মাসকয়েক চিঠি আর ফোন চালাচালি, তারপর সেই শীতেই অল্প ক'দিনের জন্য এসে বিয়েটা সেরে ফেলা | নেহাতই সাদামাটা গল্প|

অবশ্য বিয়ের পরের বছরে তুহিনা কানাডায় চলে এল যখন, গল্পের রংটা পাল্টে গিয়েছিল | ফুরফুরে দুই মন তখন খুশীর ফানুসে চড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে| নায়াগ্রার মেঘমন্দ্র জলপ্রপাত থেকে ভ্যাংকুভার আইল্যান্ড, অ্যালবার্টার রকি মাউন্টেন থেকে নোভা স্কোশিয়ার সোনালী সমুদ্রতট – পুরো কানাডা চষে ফেলতে ফেলতে দুজনের খেয়ালই হয়নি দাম্পত্য জীবনের পরিপূর্ণতার আরেকটা দিকের কথা | দ্বিতীয় বিবাহ বার্ষিকীর সময় দুজনে যখন আবার কলকাতায় এল, "এখনো তিনজন নয় কেন?" এই প্রশ্নটা নানাজনের কাছ থেকে ঠারেঠোরে শুনে বুকের মধ্যে প্রথম সংশয় জমতে শুরু করে তুহিনার | ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে ওকে সাহস দিলেও ব্যাপারটা যে আর তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না – সেটা উপলব্ধি করেছিল নীলাদ্রি | শেষে কলকাতায় থাকতেই দুজনে একদিন পারিবারিক সূত্রে পরিচিত এক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে গোপনে পরামর্শ চাইতে গেল | তিনি অভয় দেওয়ায় উদ্বেগটা সাময়িকভাবে থিতিয়ে গিয়েছিল | কিন্তু মাথার ভেতর থেকে সেই চিনচিনে অস্বস্তিটা যায়নি |

সেন্ট্রাল পার্ক আর বেশী দূরে নয় | বইমেলার ব্যানার-ফেস্টুন ইতিমধ্যেই চোখে পড়তে শুরু করেছে | কিন্তু গাড়ি এখন একটা ট্রাফিক জ্যামে আটকে | যে সময়ে পৌঁছানোর কথা, তার আর মিনিট পনেরোও বাকী নেই | রাস্তার দুদিকে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহনের অধৈর্য্য হর্ন শুনতে শুনতে ঘন ঘন হাতঘড়ির দিকে তাকায় নীলাদ্রি | ঠিক যেমন ২০১৪-র গোড়ায় কানাডাতে ফিরে গিয়ে সারাটা বছর ওরা রুদ্ধশ্বাসে দিন গুনত এক বিশেষ সুখবরের আশায় | কিন্তু সেই নভেম্বরেও যখন অবস্থার পরিবর্তন হল না, কানাডার স্বাস্থ্যপরিষেবার ওপর নিজেদের ভাগ্য সপেঁ দিয়েছিল ওরা | টরন্টো আর তার আশপাশের গোটা তিনেক ফার্টিলিটি ক্লিনিকে একের পর এক অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়েছিল ওদের – গোড়ায় ইনিশিয়াল ডায়াগনোসিস অর্থাৎ প্রাথমিক রোগনির্ণয়, তারপর সেকেন্ড ওপিনিয়ন বা সমান্তরাল অভিমত আর অবশেষে সেই দুই বক্তব্যে গরমিল থাকায় তৃতীয় জায়গায় | এবং বলাই বাহুল্য, তার সঙ্গে হাজার রকম ডাক্তারী পরীক্ষা | বেশ কয়েক মাস লেগেছিল পুরো ব্যাপারটায়, কারণ কানাডার সরকারী স্বাস্থ্যব্যবস্থা মেডিকেয়ারের একটা অসুবিধে হ'ল প্রায় সবসময়েই স্পেশালিস্টদের জন্য থাকে দীর্ঘ অপেক্ষার লাইন | আর সেই দুঃসহ মাসগুলোয় পরিচয় হয়েছিল এমনকিছু বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সঙ্গে, যা দমকা হাওয়ার মতো ওদের প্রতিটা আশার প্রদীপকে নিভিয়ে দিচ্ছিল একটু একটু করে | পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম, এন্ডোমেট্রিওসিস, প্রাইমারি ওভারিয়ান ইনসাফিসিয়েন্সি – এই খটোমটো নামগুলো তখন ফিরে ফিরে আসত ওদের রাতের দুঃস্বপ্নে | এর মধ্যে কোনটা যে তুহিনার আসল সমস্যা, সেটা যতদিনে পরিষ্কার হ'ল তার মধ্যে নীলাদ্রি ভেতরে ভেতরে নিজেকে অনেকটাই গুছিয়ে নিয়েছিল | আস্তে আস্তে মন শক্ত করছিল ভবিতব্যকে মেনে নেওয়ার জন্য | কিন্তু তুহিনা? ক্রমশঃ যখন এই বাস্তবতাকে আর অস্বীকার করা গেল না যে ও কোনোদিন মা হতে পারবে না, ওর প্রতিক্রিয়া প্রথমে অবিশ্বাস, তারপর অবুঝ কান্নাকাটির শেষে গিয়ে দাঁড়াল এক গভীর বিতৃষ্ণায়; জীবনের প্রতি, জীবনসঙ্গীর প্রতি, জগৎ সংসারের সব কিছুর প্রতি | প্রাণপণে বুঝিয়েছে নীলাদ্রি – জীবন বহুমাত্রিক, সন্তান থাকা-না-থাকার ওপর নির্ভর

করে না তার সার্থকতা, তাছাড়া এই উন্নত প্রযুক্তির যুগে মাতৃত্বের অনেক বিকল্প উপায় আছে, আর কিছুতেই কিছু না হলে নিদেনপক্ষে খোলা আছে অ্যাডপশনের রাস্তা | কিন্তু তুহিনার আসল ক্ষতটা অন্য জায়গায় – তার কাঁচের মতো ভঙ্গুর আত্মসম্মানবোধে | নানা ছোটখাটো বিষয়ে ওর এই স্পর্শকাতরতা বিয়ের পরপরই মাথাচাড়া দিতে শুরু করল যখন, নিজেকে দ্রুত মানিয়ে নিয়েছিল নীলাদ্রি | কোনো ঝামেলা হতে দেয়নি এতদিন | তবে এবার সমস্যাটা ভিন্ন স্তরের | নিজেকে আর নিখুঁত ভাবতে পারছে না মেয়েটা, সেই যন্ত্রণা ওকে প্রতিনিয়ত কুরে কুরে খাচ্ছে আর বাইরে ঘটছে তার অসহিষ্ণু বহিঃপ্রকাশ | এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত, ভেবে পাচ্ছিল না নীলাদ্রি | চাকরিতে ছুটি ভীষণ কম, তা সত্ত্বেও যতটা সম্ভব ছুটিছাটা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বাড়তি সময় কাটিয়েছে, সপ্তাহান্তে লম্বা ড্রাইভে গেছে দুজনে, কয়েকবার দূরের ট্রিপেও; কিছুতেই কিছু হয়নি |

- "বাঁদিকের গলিটা দিয়ে বেরিয়ে যাব স্যার? একটু ঘুরপথ হবে যদিও, কিন্তু এ যা জট বেঁধেছে, খুলতে বহুত দেরী |" ড্রাইভারের প্রশ্নে চমকে ওঠে নীলাদ্রি | হাতঘড়ি বলছে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে মিনিট পাঁচেক আগেই | মোবাইলে কোনো উদ্বিগ্ন ফোন বা মেসেজ অবশ্য আসেনি এখনো | নিরুপায় হয়ে সায় দিল ছেলেটার প্রস্তাবে | গাড়ি মৃদু হর্ন বাজিয়ে ঢুকে পড়ল বাঁদিকের সরু গলিটায় | ডানপাশে অন্নপূর্ণার বড় মিষ্টির দোকান, বাঁপাশে একটা ছোট্ট বিউটি সেলুন, তার পাশ দিয়ে দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে | ওপরতলাটা বোধহয় কোনো ডাক্তারের চেম্বার, সিঁড়ির মুখে লেখা ডাঃ প্রত্যয়দীপ্ত শীল, সাইকিয়াট্রিস্ট | কিছু পথচারী আর সাইকেল-স্কুটারকে সাবধানে পাশ কাটিয়ে অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিল ড্রাইভার |

সাইকিয়াট্রিস্ট? কথাটা খেয়াল হতেই ধাঁ করে মন ছুটে যায় ব্র্যাম্পটনে | ফিরে যায় পুরনো স্মৃতিতে | স্ত্রীর এরকম টালমাটাল মানসিক অবস্থায় কতকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েই একদিন রজার্সের এক প্রবীণ ভারতীয় সহকর্মীকে ব্যাপারটা খুলে বলেছিল নীলাদ্রি | ভদ্রলোক বেশ ভাল, কয়েকবার ওর বাড়িতেও এসেছেন, তুহিনাকে চেনেন | তাঁর পরামর্শে ওর জন্য এক সাইকিয়াট্রির ফ্যামিলি প্র্যাকটিসে প্রথম যেদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হ'ল, ফুঁসে উঠল মেয়ে – "কী বলতে চাইছ কী তুমি? তার মানে তোমার মনে হচ্ছে আমার মেন্টাল হেলথ্‌ও ডিটেরিয়রেট করছে? আর কত ছোট করবে আমাকে?" ইত্যাদি | শেষে অনেক কষ্টে ওকে বুঝিয়েছিল নীলাদ্রি, এটা আদৌ ওর একার জন্য নয়, ফ্যামিলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট | সন্তানহীনতার ব্যথা তো দুজনকেই ভাগ করে নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে জীবনে, তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই কাউন্সেলিংটা জরুরী | হায়, সেদিন যদি স্ত্রীর জেদের কাছে হার মেনে সত্যিই বাতিল করত যাওয়াটা, নিয়তি – সবই নিয়তি! বুকপকেটে অস্থির কাঁপুনি মোবাইলের | দেরী দেখে এবার এস এম এস এসেছে তিনটে | একটা মেলাপ্রাঙ্গণে প্রকাশকের স্টল থেকে – "স্যার, কোথায় আপনি?" আরেকটা তুষারবাবুর, যিনি বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ডে ওর চেনাশোনা এক কর্মকর্তা – "কতক্ষণ লাগবে পৌঁছাতে? ওয়েট করছে যে সবাই" | আর তৃতীয়টা – একী! এটা তো আশা করেনি! ঐন্দ্রিলা এখন এখানে? কবে এল শিলিগুড়ি থেকে? একবার জানাবে তো! এভাবে একেবারে শেষ মুহূর্তে সারপ্রাইজ? অবশ্য মেয়েটার এই মিষ্টি চমক দেওয়ার প্রবণতা আগেও কয়েকবার দেখেছে ও | মেসেজটায় লেখা, "কী, অবাক হলেন নিশ্চয়ই? সেটাই প্ল্যান ছিল | কিন্তু দেরী দেখে যে চিন্তা হচ্ছে | আসবেন তো আজ?" তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে গিয়েও নিজের আঙুলকে নিরস্ত করে নীলাদ্রি, মুখে দুষ্টু হাসি খেলে যায় ওর | থাক, আশা-আশঙ্কার দোলাচলেই থাক আরো খানিকক্ষণ – সারপ্রাইজের জবাব সাসপেন্স | তুষারবাবুকে শুধু ছোট্ট করে জানিয়ে দেয় প্রকাশকের স্টলে ফোন করে দিতে যে আর মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যেই পৌঁছে যাবে মেলাচত্বরে |

ঐন্দ্রিলা বিশ্বাস | কার্সিয়াঙে জন্ম, ওখানকারই স্কুলে পড়াশোনা, তারপর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে | বাবা নেই, মা আর এক ভাইকে নিয়ে শিলিগুড়িতে থাকে, ওখানকার প্রাইভেট স্কুলে পার্টটাইম চাকরি আর টিউশনের টাকায় একাই সংসার চালায় | কিন্তু এসব হাঁড়ির খবর নীলাদ্রি জানল কী করে? ওর সঙ্গে তো আলাপ হওয়ারই কথা ছিল না মেয়েটার | আসলে বছর কয়েক আগে ওর অনুগল্প সংকলন "এক বাক্স সন্দেশ" যখন বেরোলো কলকাতার এক নামকরা প্রকাশনা থেকে, এক বছর ধরে বাংলার বিভিন্ন বইমেলায় প্রকাশকের স্টলে আমন্ত্রণ ছিল ওর – হাজির থেকে নিজের

বইয়ে অটোগ্রাফ দেওয়ার | সেবার কলকাতা বইমেলাটা মিস করে গেলেও দুর্গাপুরের বইমেলায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল | বাঁশ-কাপড়ের স্টলে কোণের দিকের একটা চেয়ারে বসে দু'চারজনকে অটোগ্রাফ দিতে দিতে হঠাৎ খেয়াল করল একটি মেয়ে ওর বইটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করছে, পাতা উল্টে দেখছে | শ্যামলা রঙ, সাদামাটা চেহারা, চশমাশোভিত মুখে ইনটেলেকচুয়াল দীপ্তি | শেষে বইটা হাতে নিয়ে ক্যাশিয়ারের কাছে যেতেই যখন শুনল লেখক স্বয়ং এখানে উপস্থিত, একটু দ্বিধান্বিত পায়ে এসে দাঁড়াল ওর সামনে | বাড়িয়ে ধরল বইটা | প্রথম পাতায় সই করতে করতে মৃদু হেসে নীলাদ্রি যখন বলল, - "পড়ে দেখার সময় হবে আশাকরি?" ও লাজুক হেসে জবাব দিয়েছিল, "বই আমি মোটেই সাজিয়ে রাখার জন্য কিনি না |"

- "বেশ | প্রমাণ পেলে খুশী হতাম | এই নিন |" বলে ওকে ওটা ফেরৎ দিয়ে অন্য ক্রেতাদের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল নীলাদ্রি | তারপর কানাডায় ফিরে বেমালুম ভুলে গিয়েছিল ঘটনাটা | বেশ কিছুদিন বাদে এক সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে বাড়ি এসে ল্যাপটপে ইমেল ঘাঁটতে ঘাঁটতে আচমকা ইনবক্সে চোখে পড়ল "আকাশলীনা" নামটা | কৌতূহলে ক্লিক করতেই দেখল তিনটে প্রশ্ন – "আপনিই নীলাদ্রিবাবু তো? এই ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনার প্রকাশকের কাছ থেকে পেলাম, তাই প্লীজ একটু জানাবেন আমার এই চিঠি ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে কিনা | আমাকে মনে আছে কি আপনার? সেই যে দুর্গাপুর বইমেলার স্টলে আলাপ হয়েছিল | ভাবছেন হঠাৎ এরকম করে লিখলাম কেন? আপনার উত্তর পাই আগে, তারপর বলছি | ভাল থাকবেন |"

ইমেলের তলায় কোনো নামের উল্লেখ নেই | দুর্গাপুরে বইমেলায় তো অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছিল, দু'একজন উদ্যোক্তা ছাড়া কাউকেই এখন আর তেমন মনে নেই | ইনবক্সে প্রেরকের নাম দেখে তো মনে হচ্ছে ইনি মহিলা | আজেবাজে লোকের পাঠানো উড়ো ইমেল হতেই পারে এটা, তবু কৌতুহলবশতঃ ছোট্ট উত্তর পাঠিয়েছিল নীলাদ্রি | "আপনি আকাশলীনা? আপনার ইমেল ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছে, কিন্তু দুঃখিত, ওই নামের কাউকে তো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না | যাইহোক, শুভেচ্ছা নেবেন |"

দুদিন বাদেই এর প্রত্যুত্তরে যে চিঠিটা এল, সেটা চমকে দেওয়ার মতো | প্রথমতঃ জানা গেল লেখিকার নাম আকাশলীনা নয়, ঐন্দ্রিলা | কয়েক বছর আগের পুজোসংখ্যা দেশ পত্রিকায় "জ্যোতির্লিনা" নামের যে উপন্যাস বেরিয়েছিল, তার দুই নায়িকা কমলজ্যোতি আর আকাশলীনা | এর মধ্যে দ্বিতীয়টা দারুণ পছন্দ হয়ে যাওয়ায় সেই নামেই ইমেল অ্যাকাউন্ট খুলেছে | এটাও বোঝা গেল যে, এ হ'ল সেই মেয়ে যাকে নীলাদ্রি অটোগ্রাফ দেওয়ার সময় বলেছিল বইটা পড়ার প্রমাণ পেলে ভাল হয় | আর প্রমাণ বলে প্রমাণ? তার অণুগল্প সংকলনের এমন এক বিশদ বিশ্লেষণমূলক সমালোচনা লিখে পাঠিয়েছে মেয়েটা, যে নীলাদ্রির মনে হ'ল এটাই তো দেশ পত্রিকায় ছাপানো যেতে পারে | সমালোচনা মানে অবশ্য শুধু নিন্দেমন্দ নয়, যথেষ্ট প্রশংসাও রয়েছে তার মধ্যে – ওর পরিমিতিবোধ, রসবোধ, বিষয়বৈচিত্র্য ইত্যাদি নিয়ে | এক নিঃশ্বাসে পুরোটা পড়ে নীলাদ্রি মনে মনে বলেছিল, একে তো কাল্টিভেট করতে হচ্ছে !

সেই শুরু | তারপর থেকে ঐন্দ্রিলার সঙ্গে ইমেল যোগাযোগ আরও নিয়মিত হয়েছে, সাহিত্য ছাড়াও অন্য নানা বিষয়ে বার্তা বিনিময় হয়েছে, লেখা চালাচালি হয়েছে দুজনের মধ্যে | নীলাদ্রির কিছু কিছু কবিতা পড়ে তার নতুন পাঠিকা যেমন মুগ্ধ, তেমনি ঐন্দ্রিলার বিশ্বসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলো পড়ে ওর পড়াশুনোর গভীরতা সম্বন্ধে ক্রমশঃ শ্রদ্ধাশীল তার সুদূর সাগরপারের পত্রবন্ধু | কিন্তু একটা জিনিস তখনও হয়নি – ব্যক্তিগত জীবনের খবর দেওয়া-নেওয়া | সেটা শুরু হ'ল দুজনের প্রথম ফোনালাপের কিছুদিন পরে | শিলিগুড়ির কোনো এক খবরের কাগজের ক্রোড়পত্রের জন্য একটা উপন্যাসের সমালোচনা লিখেছিল ঐন্দ্রিলা | সেটা ও টরোন্টোতে ইমেলে পাঠিয়ে মতামত জানতে চাওয়ায় নীলাদ্রি উত্তর দিয়েছিল অনেককিছু বলার আছে লেখাটা নিয়ে, তাই কম্পিউটারে টাইপ না করে মুখে বললে সুবিধে হয় | ওপার থেকে সোৎসাহ সম্মতি আসায় এক রবিবার করেই ফেলল ফোন | মেয়েটার কথা বলার ধরনে একটা চমৎকার বাঁধন আছে – ওর লেখার মতোই | বাচালতা নেই কিন্তু একটা মিষ্টি উচ্ছলতা আছে | ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলা যায় ওর সঙ্গে, কিন্তু এত দূর থেকে ফোনে তো সেটা সম্ভব নয় | আস্তে আস্তে ওদের দূরভাষে কথোপকথনের

ঘনত্ব বেড়েই চলল, কারণে অকারণে কথা বলার ইচ্ছেটা মনের মধ্যে আরো জাঁকিয়ে বসতে লাগল নীলাদ্রির।

তবে এর জন্য অনেকটাই দায়ী ওর জীবনের পরিস্থিতি। তুহিনা চলে যাওয়ার পর থেকে যে গভীর শূন্যতা আর একাকিত্ববোধ ওকে গ্রাস করছিল দিনের পর দিন, সেই অন্ধকারে এক চিলতে স্নিগ্ধ আলোর মতো হয়ে এল ঐন্দ্রিলা। তাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরার জন্য ছটফটিয়ে উঠল মন। কিন্তু তুহিনা – তুহিনা হঠাৎ চলে গেল কেন? এখনো, এতোগুলো বছর পরেও ভাবতে গেলে কেমন যেন গুলিয়ে যায় সব। সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ছিল বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে, লেক অন্টারিওর পাশে এটোবিকোকে। মনোরম পরিবেশে সুন্দর সাজানোগোছানো একটা দোতলা বাড়ি, তার একতলায় চেম্বার আর ওপরে ডাক্তার নিজেই থাকেন। ভদ্রলোক ভারতীয়, নীলাদ্রির অফিস কলিগের চেনাশোনা। তিনি আর তাঁর বোন – দুজনেই মনোরোগবিশেষজ্ঞ, দুজনে মিলে চালান এই ক্লিনিক। তুহিনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আসলে ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গেই, কিন্তু সাতসকালে ফোন করে ক্লিনিক থেকে জানানো হয় ওঁকে কোনো এক জরুরী দরকারে দিন তিনেকের জন্য অটোয়া যেতে হয়েছে, নীলাদ্রিরা অন্যদিন আসতে চায় কিনা। একবার পিছিয়ে গেলে আবার কত সপ্তাহ পরে মিলবে সুযোগ, কে জানে। সেই অনিশ্চয়তায় না গিয়ে বরং ভদ্রলোকের সঙ্গে ওদিনই দেখা করা যায় কিনা জিজ্ঞেস করেছিল নীলাদ্রি। "হ্যাঁ" শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তুহিনাকে নিয়ে হাজির হয়েছিল ঠিক সময়ে। রিসেপশনিস্ট ছেলেটি আবার একজন বাঙালি, মানে দ্বিতীয় প্রজন্মের – কানাডায় জন্মেছে। অর্কপ্রভ চৌধুরী। ঝকঝকে চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা, চটপট কাজ করে। দ্রুতহাতে সব কাগজপত্রের প্রিন্টআউট নিয়ে অনেকগুলো ফর্মে সইটই করিয়ে নিয়ে গেল ভেতরের চেম্বারে। ডাক্তারের আজ মূলতঃ শোনার পালা। শুনলেন অনেকক্ষণ ধরে দুজনের কাছ থেকেই, নোট নিলেন প্রচুর, ওদের অনুমতি নিয়ে কথাবার্তার কিছু অংশ রেকর্ডও করলেন। কেস হিস্ট্রি তৈরী হবে ওসব দিয়ে। চলে যাওয়ার আগে ফলোআপ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যেতে বললেন সেই মাসেই। এবার তুহিনার একার।

"স্যার, কোন গেট্ দিয়ে গাড়ি ঢোকাব?" ড্রাইভারের প্রশ্নে চমকে উঠে সামনে তাকায় নীলাদ্রি। এসে পড়েছে মেলাপ্রাঙ্গণ, আলোয় উদ্ভাসিত সুদৃশ্য মেন গেট্ দেখা যাচ্ছে সামনে। নিঃশব্দে নিজের মোবাইল ঘেঁটে তুষারবাবুর পাঠানো নির্দেশ বার করে এগিয়ে দেয় ছেলেটার দিকে। দিতে গিয়ে আলতো আঙুল ছুঁয়ে যায় স্ক্রীনের ডানকোণে ক্যালেন্ডার অ্যাপটাতে। সারা মাস জুড়ে অন্টারিওর বিভিন্ন শহরে ভারতীয় বা বাঙালিদের কোথায় কী উৎসব-অনুষ্ঠান আর গেট-টুগেদার আছে, তার মধ্যে কোন কোনগুলোয় ওর যাবার কথা, সেসব এই ক্যালেন্ডারে ঢুকিয়ে না রাখলে মনে থাকে না ওর। আজ ফেব্রুয়ারীর কত তারিখ যেন? ওঃ, তার মানে স্কারবরোর অডিটোরিয়ামে এখন বিরাট করে বাংলাদেশ উৎসব হচ্ছে। দুদিন ধরে হয় এটা, নাচ-গান-আবৃত্তি-খাওয়াদাওয়া-আড্ডা সব মিলিয়ে একেবারে জমজমাট আসর। তুহিনার নাচের গ্রুপ নিশ্চয়ই আমন্ত্রিত – পরপর কয়েক বছর ধরেই তো পারফর্ম করছে ওখানে। অর্কও কি যাবে ওর সঙ্গে? ছেলেটা বাংলাদেশী – মানে ওর বাবা-মা এককালে বিক্রমপুরের বাসিন্দা ছিলেন। কানাডায় জন্মালেও ওর বাঙালি সংস্কৃতিচর্চায় মোটামুটি উৎসাহ আছে। তাছাড়া তুহিনা যাবে আর ও যাবে না, এরকম বড় একটা হয় না আজকাল। এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেছে এখন ওদের দুজনের জীবন। অথচ এটোবিকোকের সেই প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্টের দিন রিসেপশন ডেস্কে বসেথাকা ছেলেটাকে দেখে কি একবারও মনে হয়েছিল নীলাদ্রির যে ওর চুম্বক-আকর্ষণে তার থেকে এতটাই দূরে সরে যাবে তার আদরের তুলি? হ্যাঁ, ওটাই তুহিনার ডাকনাম। প্রথমদিকে মনোবিদের সঙ্গে একা একা সাক্ষাৎকারগুলোয় স্ত্রীকে গাড়ি করে নামিয়ে দিয়ে আর তুলে নিয়ে আসত নীলাদ্রি। তুহিনা ড্রাইভিং জানে না বলে নয়, তার যাবার প্রবল অনীহার জন্য। ওকে ওখানে নামিয়ে দিয়ে নিজের কাজটাজ সেরে আসত একটু, কারণ অনেক সময় লাগে ডাক্তারের কাছে। হঠাৎ একদিন বদলে গেল সেটা। তুহিনা কোনো কারণে এটোবিকোকের ব্যাপারে খুব আগ্রহী হয়ে পড়ল, বলতে শুরু করল অফিসে হাফ ডে নিয়ে ওকে আর পৌঁছে দিতে যাওয়ার দরকার নেই, ও নিজেই বাস বা মেট্রো ধরে চলে যাবে। নীলাদ্রি খুশী হয়েছিল মনে মনে – যাক, তাহলে ডাক্তারের থেরাপি কাজ দিচ্ছে। একদিন দেখল তুহিনা ট্রেনে বা বাসে নয়, কারুর গাড়িতে করে বাড়ি ফিরল। কে লিফ্ট দিয়েছে জিজ্ঞেস করায় বলেছিল উবার রাইডশেয়ার। কিন্তু পর

পর কয়েকবার ওই একই বার্গান্ডি রঙের টয়োটা গাড়িতে ওকে ফিরতে দেখে একদিন জানলা দিয়ে ভাল করে খেয়াল করল নীলাদ্রি – গাড়ির চালকের আসনে বসে অর্কপ্রভ। চোখে সানগ্লাসেস্, হাতে ঠান্ডা পানীয়ের বোতল। স্ত্রী বাড়িতে ঢুকতে হালকাভাবেই জিজ্ঞেস করেছিল তাকে, "তাহলে ও-ই তোমাকে ছাড়তে আসে এতটা পথ গাড়ি চালিয়ে? বলবে তো সেকথা। তা, ওকে বাড়িতে আনো না কেন – একটু চা-টা খেয়ে যেতে পারে।" আন্দাজ করতে পারেনি কথাটা যাকে বলা হচ্ছে সে কীভাবে নেবে।

- "তুমি বুঝি তোমার প্রত্যেকটা কথা আমাকে খুলে বলো? মাঝেমাঝেই যে কলিগদের সঙ্গে অফিস রিট্রিটে যাও, রাত করে বাড়ি ফেরো, আমি কি কৈফিয়ত চাই সেখানে ক'টা মেয়ে ছিল?"

- "কী বলছ কী তুলি?" নীলাদ্রি স্তম্ভিত, "কোনো কথা বলার আগে একটু ভেবে দেখতে হয় তো –"

- "এইত্তো, এবার আর্ট অফ কনভারসেশন নিয়ে লেকচার দাও; এমনিতে তো রাতদিন বলো, আমি নাকি আর্ট অফ লিসেনিং জানি না। ইউ আর সো কনডিসেন্ডিং –"

- "চিন্তা নেই, আমি আর একটি শব্দও বলব না। যাও, ফ্রেশেন আপ হয়ে নাও, কফি রেডি আছে।"

- "আই সী। এপিটোমি অফ ফরগিভনেস? থাক, দরকার নেই আমার।"

সত্যিই চুপ করে গিয়েছিল সেদিন নীলাদ্রি। কারণ ও জানত এই জেদী মেয়ের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তারপর থেকে পরিবর্তনটা শুধু হ'ল এই যে ও অর্কর সঙ্গে মেলামেশাটা খোলাখুলি করতে লাগল। যেন ইচ্ছে করে দেখিয়ে দেখিয়ে। তবু নীলাদ্রি তার নীরবতা অটুট রেখেছিল। রাখতে পেরেছিল, কারণ ও কোনোদিনই তেমন পজেসিভ নয় – কাউকে জোর করে দখলে রাখার ইচ্ছে ওর মনেই আসবে না কখনো। তবে এটা ক্রমশঃ বুঝতে পারছিল যে ওই ছেলেটার প্রতি তুলির আকর্ষণ শুধু ও সুপুরুষ, স্মার্ট আর আমোদপ্রিয় বলে নয়, আরও একটা ব্যাপার আছে। ও অতি-মিশুকে, সারাক্ষণ নেটওয়ার্কিং করে আর তার ফলে টরোন্টোর সাংস্কৃতিক জগতে প্রচুর চেনাশোনা। তাই নৃত্যশিল্পী হিসেবে তুহিনার কেরিয়ার এই শহরে দাঁড় করাতে গেলে ওর সাহায্য খুব জরুরী। নীলাদ্রিও বিয়ের পর থেকে এতগুলো বছর স্ত্রীকে নাচের ব্যাপারে কম উৎসাহ দেয়নি। দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নামকরা গুরুদের কাছে ওকে নিয়মিত নিয়ে যাওয়া, বাড়িতে সাপ্তাহিক তবলচির বন্দোবস্ত করা, বাড়ির একটা ঘরের মেঝে উপড়ে ফেলে নতুন ড্যান্সফ্লোর বসানো – সবই করেছে, কিন্তু অর্কর মতো পরিচিতির নেটওয়ার্ক আর শহরের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় অত জানাশোনা কোথায় ওর? ও নিজে ভাল লেখালেখি করে বলে অন্টারিওর বাঙালি লেখকসমাজে ওর কিঞ্চিৎ নামডাক আছে, কিন্তু সাহিত্যের ব্যাপারে তুহিনার কোনো আগ্রহই নেই। যাইহোক, এইভাবে যখন একটু একটু করে চোখের সামনে অর্কর কক্ষপথে ঢুকে যাচ্ছিল তুহিনা, তখনই একটা ঘটনা মেয়েটার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। নিজস্ব নাচের স্কুল খোলার স্বপ্নটা বাস্তবায়িত হতে সময় লাগবে বুঝে ও টরোন্টোর কয়েকটা কলেজের নৃত্যকলাবিভাগে শিক্ষকতার আবেদনও করে যাচ্ছিল। বারকয়েক চেষ্টার পর আচমকা একদিন সুযোগ পেয়ে গেল সেন্টেনিয়াল কলেজে। পার্টটাইম চাকরি হলেও এই আর্থিক স্বনির্ভরতাটাই ও মনেপ্রাণে চাইছিল এতদিন, যাতে আর নীলাদ্রির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে না হয়।

- "এই তো দাদা এসে গেছেন। জ্যামে আটকে নাজেহাল হতে হল তো? আসুন, এদিকে এই চেয়ারটায় বসুন। অ্যাই উৎপল, দাদাকে মিষ্টির বাক্স আর জলের বোতলটা দে। ও সুকুমারবাবু, শুরু করুন, শুরু করুন এবার।" পোয়েটস্ ফাউন্ডেশনের স্টলে আজ বেশ ভীড়। শুধু নীলাদ্রি নয়, আরও দুজন কবিরও বই উদ্বোধন হবে। তাঁরা অবশ্য কলকাতার। সহাস্যে আলাপ করতে এগিয়ে এলেন ওর সঙ্গে। বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করবেন প্রকাশনার কর্ণধার শ্রী প্রবীর চৌধুরী আর এবছরের আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি প্রিয়তোষ সান্যাল। তাঁরা বইগুলো হাতে নিয়ে পাশাপাশি পোজ দিতেই ছবি তোলার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এসবের মধ্যে নীলাদ্রির চোখ শুধু একজনকে খুঁজছিল, কিন্তু পাচ্ছিল না। দেরী দেখে চলে গেল নাকি? না না, তা কী করে হয়? শিলিগুড়ি থেকে এতদূর এসে দেখা না করে যেতে পারে কখনো? ইস, তখন যদি গাড়িতে আসতে আসতে মেয়েটার মেসেজের উত্তরে কিছু একটা লিখত। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক নীলাদ্রির একটা লম্বাচওড়া পরিচিতি দিয়ে ওকে ওর নতুন বই

সম্বন্ধে কিছু বলতে বললেন যখন, আগে থেকে ভেবে রাখা বক্তব্যটা আওড়াবার সময় ও বার বার অন্যমনস্ক হয়ে চারপাশে তাকাচ্ছিল। কিন্তু না, সে তো ভীড় ঠেলে হাসিমুখে এগিয়ে এল না। অনুষ্ঠান শেষে হাততালি পর্ব মেটার পর ও যখন স্টলের দরজার কাছটায় দাঁড়িয়ে নিজের বইয়ে একের পর এক সই দিয়ে যাচ্ছে, পিছন থেকে খুব চেনা গলায় কে যেন বলে উঠল,

- "কই, আজ তো বই পড়ার প্রমাণ চাইছেন না কারো কাছে?"

চমকে পিছন ফিরে দেখে দুচোখে কৌতুক নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সেই আভরণহীন সাদামাটা চেহারাটা, যার প্রতীক্ষায় এতক্ষণ ছটফট করছিল মন। অপেক্ষমান ক্রেতাদের জটলাটাকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় নীলাদ্রি, অভিযোগের গলায় বলে, "কী ব্যাপার? এত দেরী?"

- "সেকী? দেরী তো করলেন আপনি! আমি সেই কখন থেকে..."

- "আচ্ছা, এতগুলো দিন কলকাতায় রইলাম আমি, একটু আগে আসা যেত না? একটা খবর দেওয়া যেত না?"

- "জানেনই তো, সারপ্রাইজ দিতে আমার ভীষণ ভাল লাগে। যান, ওরা সব আপনার সইয়ের জন্য ওয়েট করছে, আগে ওটা সেরে আসুন। আমি এখানেই রইলাম। ওই যে, ওই স্টলটার সামনে দাঁড়াচ্ছি।"

কোনোরকমে বাকি সইগুলো দিয়ে, উদ্যোক্তাদের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ-টন্যবাদ জানিয়ে বড়সড় ফুলের তোড়াটা হাতে বাইরে এসে ঐন্দ্রিলাকে নির্দিষ্ট জায়গায় দেখতে পায় না নীলাদ্রি। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় সামনের ফুড প্যাভিলিয়নের গেটের কাছটা থেকে ডাক এল, "এই যে, এদিকে।" কাছে যেতেই আচমকা প্রশ্ন, "ফুচকা খাবেন?" প্রস্তাবের আকস্মিকতায় নীলাদ্রিকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলে ওঠে, "চলবে না? তাহলে ভেলপুরি? চিন্তা নেই, আমি খাওয়াব।"

এবার হেসে ফেলে নীলাদ্রি – "দুটোই আমার দুর্বলতার জায়গা, তবে এখন একটু গরম পানীয় হলে বেটার হয়। কফিতে আপত্তি নেই তো? ওই যে, ডানদিকের ওই কফিশপটা থেকে –"

- "উমম, আসলে চা-কফি আমি বড় একটা খাই না। অবিশ্যি আজ আপনার অনারে খাওয়া যেতেই পারে। আমি খাওয়াব কিন্তু –"

- "কেন? আমি খাওয়ালে দোষ কী?"

- "না না, প্লীজ, আজ আমি। এতদিন পর আমার প্রিয় লেখকের দেখা পেলাম, তাও এরকম একটা অকেশনে, আর তাঁকে একটা ট্রীট দেব না?"

- "ঠিক আছে। তবে যুক্তিটা বুঝলাম না। আমারও তো এতদিন পর দেখা হ'ল আমার প্রিয় – ইয়ে – সমালোচকের সঙ্গে..."

- "এভাবে বলবেন না প্লীজ। আমি আপনার অনেক পাঠকের মধ্যে একজন। আমার মন্তব্যগুলোকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই। তবে একটা কথা মন থেকেই বলছি। আপনি যদিও মূলতঃ গল্পকার, আপনার এই কবিতা সংকলনের বেশ কয়েকটা কবিতা সত্যিই অসাধারণ হয়েছে। কবিতাকে দুয়োরাণী করে রাখা কিন্তু উচিত নয় আপনার।"

- "ডু ইউ রিয়েলি মীন ইট?"

- "বিশ্বাস করুন। ইস, আমি যদি আবৃত্তিকার বা বাচিক শিল্পী হতাম, ওগুলো প্রত্যেকটা রেকর্ড করতাম। অবশ্য আপনার অনুমতি নিয়েই করতাম –"

- "ভালবাসার একটা আলাদা অধিকার থাকে ঐন্দ্রিলা। সবসময় অনুমতির লাইসেন্স লাগে না সেখানে।"

কফির দোকান থেকে ধূমায়িত কফির কাপ হাতে নিয়ে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে পাশাপাশি দাঁড়ায় ওরা দুজন। নীরবে চুমুক দিতে থাকে। একসময় হাতঘড়ির দিকে নজর পড়তে চমকে ওঠে নীলাদ্রি, "এহেঃ, অনেকটা দেরী হয়ে গেছে..."

- "ও হ্যাঁ। যেতে হবে এবার আপনাকে, তাই না?"

- "মানে কাল সকাল সকাল ফ্লাইট তো। এখন বাড়ি ফিরতেই অনেকটা সময় লাগবে, রাস্তাঘাটের যা অবস্থা।

- "ভাল করে কথাই হ'ল না আপনার সঙ্গে এবার। যাকগে, গাড়ি কোথায় রেখেছেন? চলুন, হাঁটা শুরু করি সেদিকে।"

- "না না, পার্কিং একটু দূরে। হেঁটে যেতে হবে না। আমি ড্রাইভারকে ফোনে বলে দিচ্ছি ওই সাইড-গেটটায় আসতে।"

- "বেশ। আমিও ওখান দিয়েই বেরিয়ে যাই তাহলে। বাস-স্ট্যান্ডটা কাছে হবে।"

- "বাসস্ট্যান্ড? কোথাকার বাস? কোথায় যাবে তুমি – ইয়ে, মানে, কোথায় যাবেন আপনি?"

- "আমাকে নির্দ্বিধায় 'তুমি' বলতে পারেন। সংকোচের কোনো

কারণ নেই। কলকাতায় এলে আমি শিয়ালদার কাছে একটা চেনাশোনা হোটেলে উঠি। এবারও সেখানেই। আপনার মোবাইলটা রিং হচ্ছে বোধহয় –"

- "ওঃ, তাই তো। আমার ড্রাইভার ফোন করছে। ওটা কিন্তু একতরফা হয় না ঐন্দ্রিলা।"

- "কোনটা?'

- "ওই যে, 'তুমি' বলার ব্যাপারটা। দাঁড়াও, এক মিনিট, ফোনটা একটু করে নিই..."

ফোন রেখে নীলাদ্রি বলল, "চলো, ওই ফুটপাথটায় গিয়ে দাঁড়াই, গাড়ি ওখানটাতেই আসবে।"

- "ঠিক আছে; বিদায়! আমি তাহলে এগোই বাসস্ট্যান্ডের দিকে..."

- "প্রশ্নই ওঠে না।"

- "মানে?"

- "সিম্পল। তুমি আমার গাড়িতে যাবে। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব হোটেলে।"

- "না না, কোনো দরকার নেই ওসব ঝামেলা করার, আপনার আরও অনেক দেরী হয়ে যাবে –"

- "উঁহু; আমার দুটো রিকোয়েস্টই খুব স্ট্রেটফরওয়ার্ড। এক, তুমি বাসের কথা ভুলে যাও, আর দুই, অ্যাবসোলিউটলি নো 'আপনি' ফ্রম নাও অন।"

একটা দুধসাদা সুজুকি গাড়ি মেলাপ্রাঙ্গণের ভীড়ভাট্টা কাটিয়ে এইমাত্র বড়রাস্তা ধরল। পিছনের সীটে দুই যাত্রী। রাত পেরিয়ে সকাল হলেই আবার তাদের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব; কিন্তু সে দূরত্ব নিছকই ভৌগোলিক। দুটি মন কখন যে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে – খেয়াল করেনি দুজনেই।

ইবলিশ

নূপুর রায়চৌধুরী

সুমেরু অঞ্চলের নিঝুম জনশূন্য জায়গায় এই কেবিনটা। চারপাশ শুনশান, এত নিস্তব্ধ যে বাইরের হাওয়ার শোঁ-শোঁ আওয়াজটা রীতিমতো ভূতুড়ে বলে বোধ হয়, মনে হচ্ছে কে যেন সমানে বলে চলেছে, 'সাবধান, সাবধান'; বেশিক্ষণ শুনলে গা ছমছম করে। এদিকটা বেছে নেওয়ার একটা বড় কারণ আছে। তুন্দ্রার বরফ-মাটি এখানে তেমন শক্ত নয়, বসন্তের শুরুতে, মানে মে-জুন মাসে, এরকম জায়গাতেই সাধারণত পোয়াতি মাদী আর্কটিক নেকড়ে তার বাসা বাঁধে।

সেদিন এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে কেবিন থেকে প্রায় মাইলখানেক দূর চলে গিয়েছিলাম। তখনই সদ্য খোঁড়া নিচু গর্তটা আমার নজরে পড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে পুলকে বুকটা নেচে উঠেছিল। ব্যস আরকি, এবার শুধু বাসার মালকিনকে আর ছানাগুলোকে চোখে চোখে রাখতে পারলেই কেল্লা ফতে।

টেবিলের লুকোনো খাঁজ থেকে কোল্ট রিভলভারটা বের করে সেটাকে দু'চারবার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার কায়দা করে লুফে নিই। যন্ত্রটা ভারি পয়া। বয়স বহুৎ হলে কী হবে, ওটা দিয়ে আজ অবধি যা যা কাজ করেছি, সেগুলোর একটাও মার খায়নি। সিলিন্ডারের সবকটা চেম্বারেই গুলি ভরা আছে। তীক্ষ্ণ সরু চোখে পরখ করে, যন্ত্রটার চকচকে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করি; নলের মুখে চকাস করে একটা চুমু খাই। দেখে মনে হচ্ছে যন্তরটাও যেন কেমন মুখিয়ে আছে – কখন আবার রক্তের স্বাদ পাবে, বাতাসে বারুদের গন্ধ ছড়াবে।

আজই? নাকি কাল? আজ না হলে কাল, নাহয় পরশু, সুযোগ তো আসবেই একদিন নাহয় আরেকদিন। এমনি এমনি কি ওঁৎ পেতে বসে আছি এই হিমশীতল মুলুকে? মেয়েদের সৌখিন স্কার্ফ, কোট, কেপ তৈরিতে আর্কটিক নেকড়ের দুধ-সাদা লম্বা, রেশমি, পশমের দারুণ চাহিদা। আর আর্কটিক নেকড়ের বাচ্চাগুলোও বিদেশের বাজারে চড়া দামেই বিকিয়ে যাবে। ওহ, এই দাঁওটা মারতে পারলে কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত, পকেটে বেশ কিছু রেস্ত আসবে।

গুণে দেখেছিলাম দলটাতে সাত-আটটা নেকড়ে আছে। দিনেরবেলা বাছাধনেদের টিকিটি মেলা ভার, মনে হয়

তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমায়। ভোর হওয়ার আগে আর সন্ধ্যার মুখে দেখি ওদের যত ব্যস্ততা – সকলে মিলে দল ভারী করে শিকারের সন্ধানে, এদিক ওদিক চনমনিয়ে দৌড়ে বেড়ায়। ছেলে নেকড়েগুলো মেয়েদের থেকে আকারে বড় হয়, মেয়েগুলোর মুখও ছেলেদের তুলনায় সামান্য পাতলা হয়। দলের আলফা মদ্দা আর তার প্রেয়সী মাদীর জুটিটাকে চিনতে আমার অভিজ্ঞ চোখ ভুল করেনি। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকেই মাদী নেকড়েটাকে চোখে চোখে রেখেছি। দূর থেকে হলে কী হবে, আমার শক্তিশালী দূরবীনের আয়নায় ওর শ্লথ হয়ে আসা চলাফেরা, একাচোরা ভাব, আর ভারী পেট – সবই ধরা পড়েছে। তখন থেকেই তক্কে তক্কে আছি। মে মাসের গোড়াতেই নেকড়েটা উধাও হয়ে গেছিল। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে ওর বাচ্চা বিয়োবার সময় আগত। তারপর এই ৬ সপ্তাহ বাদে গতকাল, ১৩ই জুন আবার ওটাকে দেখতে পেলাম, দেখে মনে হ'ল বেশ কিছুটা রোগা হয়ে গিয়েছে। দূরবীন দিয়ে আড়ি পাততে পাততে, নেকড়ে ছানাগুলোকেও একদিন এক ঝলক দেখতে পেয়েছি, পুচকু পুচকু গোটা পাঁচেক মায়ের পায়ে পায়ে গর্তের মুখটার কাছে এসে খেলা করছে। আলফা মদ্দাটা বোধয় খানিক মাংসের খন্ড ভেট দিতে এসেছিল, মা নেকড়েটা তা মুখে নিয়েই ছানাপোনা সমেত সুড়ুৎ করে আবার গর্তের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। যাকে বলে, এক্কেবারে আহামরি পিরীতি।

এই সময়ে আর্কটিক সাগরের বেশিরভাগ বরফ গলে গেছে, বরফের ঝড় হওয়ার সম্ভাবনাও এখন খুবই কম। কিন্তু আজ ভোর থেকেই ছেঁড়াখোঁড়া তুষারপাত হচ্ছে। এতটা বেলা হয়ে গেল, এখন অবধি দলের কোনো নেকড়েকে খাবার নিয়ে গর্তের মুখে আসতে যেতে দেখিনি, তার মানে মা নেকড়েটা অনেকক্ষণ ধরেই অভুক্ত আছে। তাহলে কি আজই সেই দিন? মা নেকড়েটা ঘুরেফিরে কেবিনের পিছনদিকে ঝাঁক মারছে, যাক, গন্ধটা তাহলে ঠিকই পেয়ে গিয়েছে, পাবেই তো! নেকড়েগুলো প্রায় দেড় মাইল দূর থেকে শিকারের গন্ধ পায়, মানুষের চেয়ে ১০০ গুণ বেশি শক্তিশালী ওদের ঘ্রাণক্ষমতা। ওরা ঘোরতর মাংসাশীও বটে, যাকে বলে একদম সর্বভুক, মাস্ক অক্স, খরগোশ, সীল, পাখি, কিছুই ছাড়ে না, তবে ক্যারিবু দেখলে ওদের সবুজ কাঁচের মতো চোখের মণি লোভে যতটা চকচক করে, অন্য আর কিছুতেই ততটা করে না।

আমি দুলকিচালে একবার কিচেনে ঢুঁ মারলাম, পিছ-দরজার দিকে সিলিঙের লোহার আংটা থেকে ঝোলানো ক্যারিবুটার দিকে প্রশংসার চোখে তাকালাম, গত সন্ধ্যেয় ওটা শিকার করেছিলাম। ক্যারিবু-মাংসের সামান্য একটা মিষ্টি গন্ধ আছে; খেতে অনেকটা গরুর মাংসের মতো, বেশ নরম ভাব রয়েছে, মেদহীন, পুষ্টিগুণে ভরপুর। সাধে কী নেকড়েদের এত ঝোঁক ওদের দিকে!

আমি স্থির পায়ে টেবিল থেকে রিভলবারটা হাতে তুলে নিই, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সন্তর্পণে একবার পরীক্ষা করে নিই। হ্যাঁ, সব আচ্ছা হ্যায়। লোডেড অস্ত্রটা নিয়ে পা টিপে টিপে এবার এগিয়ে যাই দরজার দিকে। মালুম হচ্ছে মাদী নেকড়েটা এখন রীতিমতো তেতে উঠেছে। দরজায় কান পাতলে আমি ওর মৃদু ঘড়ঘড়ে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, এইমাত্র দরজার গায়ে দু'একবার আঁচড়ও কাটল।

হুঁ, এইবার সময় হয়েছে। ঝনাৎ করে আচমকা দরজাটা খুলেই নেকড়েটাকে তাক করে আমি ডানহাতের তর্জনী দিয়ে রিভলবারের ট্রিগারে চাপ দিলাম।

হঠাৎ কোথা থেকে বিদ্যুতের মতো আলফা মদ্দাটা মা নেকড়েটার সামনে চলে এল, আর এক ধাক্কা মেরে সেটাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিল। গনগনে আগুনের গোলাটা মদ্দাটার দেহ এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেল। এক খাবলা গরম, আঠাল রক্ত ছিটকে এসে আমার চোখেমুখে ছড়িয়ে গেল; বাঁ-হাতের পিছন দিয়ে সেসব মুছতে মুছতেই আমি চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম, মা নেকড়েটা উল্কার বেগে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে ওর গর্তের দিকে। রাগ, হতাশায় আমার মাথাটা ঝাঁঝাঁ করতে লাগল। আমি ঘৃণাভরে মাটিতে পড়ে থাকা আলফা নেকড়েটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। বিশাল শরীরটা কেঁপে কেঁপে স্থির হয়ে গেছে, ওর বরফ-সাদা লোমগুলো কালচে-লাল রক্ত-রসে মাখামাখি হয়ে কী বিচ্ছিরিটাই না দেখাচ্ছে এখন! আমি থুক করে একদলা থুতু ফেলে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলে উঠলাম, 'শালা, একটা আস্ত ইবলিশ'।

প্রত্যাবর্তন

বীরেশ্বর মিত্র

ঠিক সময়েই প্লেন ল্যান্ড করল গোয়ার নতুন ঝকঝকে এয়ারপোর্টে | না, আগে কখনো এই এয়ারপোর্টে আসিনি | প্রয়াত চিফ মিনিস্টারের নামে এই এয়ারপোর্টের নামকরণ হয়েছে | হাতে ছোট একটি স্যুটকেস | এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে খোঁজ করছিলাম আমার নাম লেখা প্ল্যাকার্ডের| নিশ্চয়ই গাড়ি পাঠিয়েছে আমার জন্য | ইতিমধ্যে একটি ছেলে, না – যুবক বলাই ভাল, দৌড়ে এসে আমার হাত থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে বলল, "ওয়েলকাম স্যার |" ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম; চিনতে পারলাম না, কিন্তু মনে হচ্ছিল মুখের মধ্যে কিছু অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে | সে বলল, "স্যার, আপনি আমাকে চিনবেন কী করে? আপনি তো কখনো আমাকে দেখেননি; আমি কিন্তু আপনাকে চিনি |" রহস্য আরো ঘনীভূত হ'ল| অবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছি| ও আবার বলল, "আমাদের বাড়িতে আপনার ছবি আছে বাবার সাথে, অনেক পুরনো ছবি কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনতে পেরেছি| স্যার, আমার নাম কিশোর, প্রশান্ত কদম-এর ছেলে |" ওই নাম শুনে আমি প্রায় ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলেছিলাম, ওই আমাকে ধরে সামলে দিল | পৃথিবী যেন আমার সামনে থমকে গেছে! কিছুক্ষণ পর সম্বিত ফিরে পেতে সে বলল, "স্যার, কোনও চিন্তা করবেন না, আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দেব, আপনার কোন অসুবিধা হবে না| কিন্তু যাবার পথে আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব |" এক হাতে আমার স্যুটকেস আর অন্য হাতে খুব যত্নের সাথে আমার হাত ধরা – এ বড় নিশ্চিন্তের হাত! ওর নতুন মারুতি গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে এল একটি রেস্টুরেন্টের সামনে| বোর্ডে লেখা 'প্রশান্ত হোম ফুড'|

দরজার সামনে প্রদীপ-ফুল-চন্দন দিয়ে আমাকে বরণ করা হ'ল; এক মহিলা গড় হয়ে আমাকে প্রণাম করলেন | যুবকটি পরিচয় দিল, "ইনি আমার মা |" অনেক স্মৃতি ভিড় করে আসছিল | ছোট্ট একটি ছেলে আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল আর মায়ের সাথে কানে কানে কথা বলছিল | আমার চোখ ভিজে গিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে এল | মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছি | কাউন্টারের ওপর টাঙানো প্রশান্তর ছবি, সঙ্গে আমি | কোন একটা অনুষ্ঠানে প্রাইজ দেবার ছবি| বেশ ভাল রকমের চা-জল খাবারের আয়োজন করেছিলেন তাঁরা | ওঁদের কাছে আমি যেন সাক্ষাৎ ভগবান | আমার জন্যই নাকি ওঁদের এই জীবন | খাওয়া সেরে বিদায় নিলাম; কিশোরই হোটেলে পৌঁছে দিল | আবার আসব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসতে হ'ল|

হোটেলে আসার পর আমার চেতনা ঘিরে কেবল প্রশান্ত কদম | তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলাম | বেরোতে হবে| এই কম্পানি, যেটা আমার হাতে গড়া, আজ তার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে| আমি কম্পানি ছেড়েছি প্রায় কুড়ি বছর আগে, কিন্তু এরা আমার সঙ্গে বরাবর যোগাযোগ রেখেছে, বিশেষ করে এদের নতুন ম্যানেজমেন্ট | তাদেরই বিশেষ অনুরোধে আমার এখানে আবার আসা | দেখলাম আমার সব খবরাখবরই এরা রাখে | এদের আন্তরিকতায় সাড়া না দিয়ে পারলাম না| খবর নিয়ে জানলাম, আমার সময়কার বিশেষ কেউ আর নেই | কিছু সুপারভাইজার এবং মেসিন অপারেটর আছে| অনুষ্ঠান ভালই হ'ল; বেশিটাই আমার গুণ-কীর্তন| পরের দিন ফ্যাক্টরি ভিজিট্| আমারও খুব কৌতূহল ছিল পঁচিশ বছর আগের সেই ফ্যাক্টরির এখন কী অবস্থা দেখবার জন্য|

সময়মতো গাড়ি এল, সঙ্গে একজন ম্যানেজার| প্রায় চল্লিশ মিনিটের পথ | গল্প করতে করতে গেলাম – যতটুকু খোঁজখবর পাওয়া যায়! আমারও কৌতূহলের শেষ ছিল না | দেখলাম প্রশান্ত কদমের কথা এরা সবাই জানে আর আমার কথাও শুনেছে| ফ্যাক্টরিতে পৌঁছালাম| বিরাট আয়োজন! বড় গেট ফুল দিয়ে সাজানো| অফিস পর্যন্ত রেড কার্পেট বিছানো| অফিসে ঢোকার মুখে আবার সেই বরণের আয়োজন | ভিভিআইপি সম্মান! ফ্যাক্টরি ঘুরে দেখতে চাইলাম | দেখলাম অনেক বড় হয়েছে | অনেকগুলো নতুন ডিপার্টমেন্ট তৈরী হয়েছে| পুরনো কর্মী এবং সুপারভাইজাররা আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে প্রণাম করল| খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা আমার| মেইন অডিটোরিয়ামে বিশাল আয়োজন | বিভিন্ন বিভাগে অনেককে পুরস্কৃত করা হ'ল| তাছাড়া অনেকের বক্তৃতা ছিল| আমারও বক্তব্য ছিল, আর সঙ্গে ছিল স্মৃতিচারণ|

ঘুরে ফিরে একটাই নাম আসতে লাগল – প্রশান্ত কদম| আমার এই গল্পের মুখ্য চরিত্র | মনে পড়ে, ফ্যাক্টরি শুরু করার প্রথম

ব্যাচের ডিপ্লোমা এঞ্জিনিয়ার প্রশান্ত। আমারই সিলেকশন। বিদেশ থেকে আনা একটি নতুন মেশিনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাকে। খুবই বুদ্ধিদীপ্ত ছেলে। অনেককিছু সাজেশন দিত। সেই সাজেশনগুলো ব্যক্তিগতভাবে আমার অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগত। সেগুলো আমার টিমের সঙ্গে শেয়ার করতাম আর তার অনেকগুলোই আমরা কার্যকরী করতে পেরেছিলাম। ওকে আমরা কোয়ালিটি সারকেল আর কাই জেন দায়িত্ব দিয়েছিলাম। প্রশান্ত কদমকে ঘিরে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল। ভেবেছিলাম একদিন ও এই ফ্যাক্টরির দায়িত্ব নেবে। প্রতিদিন রাউন্ডে গিয়ে প্রশান্তর সঙ্গে দেখা না করলে ভাল লাগত না। ভগবান হেসেছিলেন! সেটা বুঝেছিলাম অল্প কয়েকদিন পর।

কিছুদিনের মধ্যেই এল সেই দুঃস্বপ্নের রাত। আজও ভাবলে গা শিউরে ওঠে। টেলিফোনের আওয়াজে ঘুম ভেঙেছিল। অনেকক্ষণ ধরে বাজছিল। তখন মোবাইলের অত চল ছিল না। ভেবেছিলাম আমেরিকার ফোন। মন্দিরা ওখানে ছিল মেয়ের কাছে। ঘুম চোখে ফোন ধরলাম। ফ্যাক্টরি থেকে শিফট ইনচার্জের ফোন – "CNC মেসিনে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ায় প্রশান্ত গুরুতর আহত। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; স্যার, প্লিজ চলে আসুন।" শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল আমার।
কম্পানির ডাক্তার কাছেই থাকেন; তাঁকে ফোন করে, সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছালাম। বাইরে বেশ ভিড়। শুনলাম প্রশান্তকে এমারজেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সবার সম্মিলিত প্রার্থনাতেও কিছু কাজ হ'ল না। ওখানকার ইনচার্জ ডাক্তার জানালেন যে অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো গেল না। বড্ড বেশি রক্তক্ষরণ হয়েছে। পায়ের তলায় যেন মাটি সরে যাচ্ছে। অসহায় আমরা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

পরের দিন দাহ হ'ল। সারা ফ্যাক্টরি এবং আশেপাশের প্রচুর মানুষ এসেছিল। সবাই খুব ভালবাসত প্রশান্তকে। আমরা সবাই শোকাহত; কাজে মন বসানো যাচ্ছিল না। হেড অফিসে রিপোর্ট পাঠানো হ'ল। তার আগে ছিল ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টরের বিস্তারিত ইনভেস্টিগেশন। জানা গেল অত দামি বিদেশী মেশিনের সেফটি সিস্টেম ফেল করেছে। এ ব্যাপারে প্রশান্তর কতটা দায়িত্ব ছিল বুঝবার উপায় নেই। ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টরকে তো সামলানো গেল, কিন্তু হেড অফিস এই ঘটনাতে খুবই বিরক্ত। বড় সাহেবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলাম যে ওদের গরিবের সংসারে অন্তত পাঁচলাখ টাকা দান করতে। এই কম্পানিটা আমরাই খেটেখুটে বড় করেছি এবং আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল। পাঁচলাখ টাকা অসহায় পরিবারকে দিতে কোনই অসুবিধা হবার কথা নয়। তিনি বলেছিলেন প্রশান্তর যা প্রাপ্য যেন তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া হয়; বাকি আলোচনা উনি যখন আসবেন তখন হবে। প্রশান্তর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, তার দেওরকে নিয়ে আমার বাড়িতে এসেছিল, আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছিল, সে দৃশ্য আমি কোনদিনও ভুলতে পারব না। মানসিকভাবে আমিও ছিলাম বিধ্বস্ত। অশ্রুসজল চোখে আমি কথা দিয়েছিলাম ওদের জন্য আমি যথাসাধ্য করব। হেড অফিসের অপেক্ষায় না থেকে কম্পানির সবাইমিলে আমাদের একদিনের মাইনে একত্রিত করে প্রশান্তর স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছিলাম। প্রশান্তর ভাইও ডিপ্লোমা পাস; বলে কয়ে জানাশোনা এক কম্পানিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম তাকে। হেড অফিসে সব খবর পৌঁছেছিল।

কিছুদিন পর বড় সাহেব এলেন। উনি কম্পানির সর্বেসর্বা, কম্পানির চেয়ারম্যান। আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমার কাছ থেকে সব শুনলেন। আমি ওঁর কাছে কিছুটা সংবেদনশীল ব্যবহার আশা করেছিলাম কিন্তু অবাক ব্যাপার – উনি সবার সামনে আমাকে যাচ্ছেতাই বলে অপমান করলেন। বললেন, আমরা ভাল ভাল কলেজের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র হতে পারি কিন্তু আমরা অযথা সেন্টিমেন্টাল এবং ইমোশনাল; বিজনেস চালানোর ব্যাপারে নিতান্তই অজ্ঞ। ইন্ডাস্ট্রি চালাতে গেলে এই ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে।
আমি ওঁর খুবই পছন্দের এবং বিশ্বস্ত পাত্র ছিলাম। এমন ব্যবহার আমি ওঁর কাছে মোটেই আশা করিনি। অত্যন্ত অপমান বোধ নিয়ে ওঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সেই সঙ্গে ওঁর সেক্রেটারির সামনে বসে একটি পদত্যাগপত্র লিখে তার হাতে দিয়ে এলাম। সেক্রেটারি আমাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যাতে এইরকম কঠিন সিদ্ধান্ত না নিই এবং এও বলেছিল, "মাথা ঠান্ডা রাখুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।" কিন্তু আমি মনস্থির করে নিয়েছিলাম। আমার আত্মসম্মানের ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। "চিঠিটা সাহেবকে দিয়ে দিও", বলে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

এই সিদ্ধান্তটা নিতে পেরে মন খুব হালকা হয়ে গেল। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। নিজেকে সত্যিকারের বিজয়ী মনে হচ্ছিল। তার আগে পর্যন্ত অনেককিছু ভেবে মনটা অস্থির হয়ে ছিল। টাকাটাই কি সব! মানুষের মধ্যে কোনরকম মানবিকতা থাকবে না! নিজের কম্পানির কর্মচারীকে সাহায্য করার বিন্দুমাত্র মানসিকতা নেই! না, এই কম্পানিতে কাজ করা সম্ভব নয়।

ভেবেছিলাম আর কাজে ফিরব না। কিন্তু যেখানে প্রচুর কাজের দায়িত্ব আমার ওপর, সেখানে ফিরে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। দাঁতে দাঁত চেপে, মুখ বুঝে কাজ করে যেতে হবে; চেয়েছিলাম ইমিডিয়েট রিলিফ। কিন্তু বার বার ডিরেক্টরদের কাছ থেকে অনুরোধ আসতে লাগল যাতে আমি পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নিই, ম্যানেজমেন্ট আমার পদত্যাগ-চিঠি অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি নয়। আমিও নাছোড়বান্দা। মনটাই ভেঙে গিয়েছিল। ওরা কিছুদিন সময় চেয়েছিল। শেষপর্যন্ত তিন মাসের মাথায় ছাড়া পেলাম। ততদিনে মন্দিরা ফিরে এসেছে আমেরিকা থেকে ভারতে। সে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু আমি আত্মসম্মান খুইয়ে কোনোমতেই ওখানে কাজ করতে রাজি নই। শেষ দিনে কম্পানির বাইরে হল ভাড়া করে আমার বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিল ওরা। প্রতিটি স্টাফ এবং ওয়ার্কাররা এসেছিল। চোখের জলে বিদায় নিলাম।

ফিরে এলাম নিজের জায়গায়। বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ইন্ডাস্ট্রিতে মোটামুটি নামডাক থাকায় একটি পছন্দমতো চাকরির অফার পেয়ে গেলাম, যে অফার অগ্রাহ্য করা যায় না। তবে স্থান পরিবর্তন করতে হ'ল। প্রস্তুত ছিলাম। ম্যানেজমেন্টের অগাধ বিশ্বাস। তাই কাজে ডুব দিলাম। একটি ছোট্ট কম্পানি দেখতে দেখতে অনেক বড় হয়ে উঠল। দায়িত্ব বাড়তে লাগল। কম্পানির সবকটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের দায়িত্ব এসে পড়ল। পদোন্নতি হ'ল। Executive Director, সবথেকে সম্মানের পোস্ট।

দেখতে দেখতে একদিন অবসর গ্রহণের দিন এসে গেল। সসম্মানে বিদায় সম্বর্ধনা দিল কম্পানি। প্রায় সব স্বপ্নই পূরণ হ'ল। কিন্তু কুড়ি বছর আগের সেই ঘটনা মাঝে মাঝেই দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

আগের কম্পানির সিলভার জুবিলি অনুষ্ঠানে আমি বিশেষ অতিথির আমন্ত্রণ পাব স্বপ্নেও ভাবিনি। ওখানের সঙ্গে আমার আর কোন যোগাযোগই ছিল না। শুনেছিলাম ম্যানেজমেন্ট বদলেছে কয়েক বছর আগে। আর বড় সাহেবও গত হয়েছেন কয়েক বছর আগে। পুরনো কর্তারা কেউ নেই আর। তারা কোথাও থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল মাস তিনেক আগে এবং আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিল। সব ব্যবস্থা ওদের। সময়মতো টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছিল। এত সম্মান আশা করিনি। একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

অনুষ্ঠান শেষে ফিরে যাবার পালা। সন্ধ্যের ফ্লাইট। কথা দিয়েছিলাম কিশোরের বাড়ি হয়ে যাব।

সেখানে পৌঁছে দেখলাম বাড়ির লোকজন ছাড়াও অনেকে এসেছেন। আদর-যত্ন করে বসিয়ে জলখাবার নিয়ে এল এক থালা। চারপাশে উৎসুক জনতার ভিড়। বিদায় নেবার পালা। কিশোরের ছোট্ট ছেলে এতক্ষণ দূর থেকে সব দেখছিল। সে হঠাৎ এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। কোলে তুলে নিলাম। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম একেবারে প্রশান্তর মুখের আদল শিশুটির মুখে। ওর নাম রেখেছে 'সংগ্রাম'। কিছুতেই কোল থেকে নামবে না সে। কান্নাকাটি শুরু করে দিল। মহা সমস্যা! মা'র কোলেও যাবে না। অনেক বুঝিয়ে ওকে ওর মা'র কোলে দিলাম। বাড়ির সবাই গড় হয়ে প্রণাম করল। কিশোর বলল বাবা নেই, আমিই এখন ওদের অভিভাবকের মতন। কথা দিলাম আবার আসব। বললাম কোন প্রয়োজন হলে যেন আমাকে জানায়। গাড়িতে ওঠার সময় ছেলেটি আবার দৌড়ে এল। আমাকে যেতে দেবে না। ওর ভাষা না বুঝলেও ওর চোখের জল অনেক কিছু বলে দিচ্ছিল। কোথায় যেন হারিয়ে যাওয়া প্রশান্তকে পাচ্ছিলাম ওর মধ্যে। অনেক কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করে গাড়িতে উঠলাম।

দূর থেকে ওর হাত নাড়া দেখতে পাচ্ছিলাম। অনেক না বলা কথা, চাপা বেদনা ফুটে উঠছিল। আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম স্মৃতির গভীরে। সম্বিৎ ফিরে পেলাম কিশোরের কণ্ঠস্বরে – "স্যার, এয়ারপোর্টে এসে গেছি।"

ইটাচুনা রাজবাড়ি

মালবিকা চ্যাটার্জী

গিয়েছিলাম ইটাচুনা রাজবাড়িতে। কলকাতা থেকে গাড়িতে ৩ঘন্টার পথ অতিক্রম করার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল – কাঁসার থালা বাসনে খাবার খাব। শুনেছিলাম সেখানে নাকি কাঁসার বাসনে বাটি সাজিয়ে খেতে দেয়, রান্নাও নাকি সেই সাবেকি বাঙালি ধাঁচেই হয়। মনটা চনমনিয়ে উঠেছিল, ছোটবেলায় যেমন কাঁসার বাসনে খাওয়ার চল ছিল সেই অনুভূতিটা আবার অনুভব করার জন্য। একেবারেই ভাবিনি রাজবাড়ির রমরমার গল্প শুনব বা আর কিছু। সেটা উপরি পাওনা হিসেবে রয়ে গেল।

রাজবাড়িতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে মালপত্র নির্ধারিত ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য দুটি ছেলে হাজির হয়ে গেল। একজন মহিলা কাঁসার গ্লাসে লেবুর শরবৎ হাতে এগিয়ে এলেন আমাদের আহ্বান জানাতে। বেশ লাগল এই আপ্যায়ন। বড় বড় হোটেলে তো এমন প্রথা আছেই, কিন্তু সে যেন একটু যান্ত্রিক মতো লাগে। এখানে পুরনো বাংলার আন্তরিকতার ছোঁয়া পেলাম মনে হ'ল।

এই রাজবাড়িতে অতিথিদের শোবার ঘরগুলি পারিবারিক আত্মীয়তার নামে নামাঙ্কিত। পুরনো জমিদার বাড়ির উঠোন, দালান, ঘরদোর সবটাই সেইসব দিনের ঐতিহ্য আর ইতিহাস বহন করছে... রোমাঞ্চ অনুভব করতে এতটুকু অসুবিধে হ'ল না। আমার বোনরা আর আমরা ছিলাম 'ঠাকুমা' ও 'বড়পিসি' ঘরে। ঘরের সজ্জায় বনেদি ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

এরপর দুপুরের খাবার খেতে যাবার সময় হয়ে এল, গেলাম খাবার ঘরে। ঘরের নাম দিয়ে টেবিল গুছিয়ে রাখা আছে। প্রতিদিন এঁদের রান্নাঘরে ভাত, ডাল, তরকারি যেমন হয় তেমনই হয়, তার সঙ্গে মাছ মাংসের পদগুলো নিজের মনমতো বেছে নেওয়া যায়। মাছ-মাংস ছাড়া আর যে কোনো খাবার প্রয়োজনমতো আবার করে পরিবেশন করে যান রান্নাঘরের কর্তৃপক্ষ। শেষ পাতে দই-মিষ্টি দিয়ে হ'ল মধুরেণ সমাপয়েৎ।

আমাদের জানানো হয়েছিল যে শেষ দুপুরে, বিকেল নাগাদ একজন গাইড এসে রাজবাড়ির ট্যুর দেবে। তাই আমরা দুপুরে খাওয়ার পর কিছুক্ষণ রাজবাড়ির এধার-ওধারে ঘোরাঘুরি করলাম। রাজবাড়িতে একটি ছোটখাটো ঘরোয়া মতো দোকান আছে। দোকানের নামটিও বেশ – "প্রচেষ্টা", যেখানে গ্রামের মানুষের প্রচেষ্টায় হাতে তৈরী অনেক সামগ্রী তাঁরা রাখেন। সেখানে আমরা খানিকটা সময় কাটালাম – কেনাকাটাও হ'ল। তার খানিক পরে গাইড মহাশয় হাজির হলেন এবং শুরু হ'ল ট্যুর আর গল্পগাছা। তাঁর গল্পের ঝুলি থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম আমরা।

ইটাচুনা পশ্চিমবঙ্গে হুগলি জেলার একটি গ্রাম। কলকাতার কাছে এই গ্রামটির লোকসংখ্যাও তেমন উপচে পড়া নয়। বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষাই এখানে চালু আছে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষেরই কথোপকথন চলে বাংলায়। ইটাচুনা-খন্যানের গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থান পাণ্ডুয়ায়। ১৯৫০ সালে এই গ্রামে বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয় নামে একটি কলেজের উপস্থাপনা হয়। বর্ধমান ইউনিভার্সিটির লেখাপড়ার ধারা এখানে অনুসরণ করা হয়।

এখানেই অবস্থিত ইটাচুনা রাজবাড়ি। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কর আদায়ের জন্য বাংলা আক্রমণে আসা দুর্ধর্ষ মারাঠা বর্গীদের কোনও কোনও গোষ্ঠী সুন্দরী বাংলায় থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। ১৭৬৬ সালে মারাঠার কুন্দন পরিবার মনস্থির করল তারা হুগলির এই জায়গায় বসবাস শুরু করবে। বাংলায় থাকার সুবাদে মারাঠী কুন্দনদের পদবী পরিবর্তিত হয়ে কুণ্ডু হয়ে গেল। সেই কুণ্ডু পরিবারে জমিদার সাফল্য নারায়ণ কুণ্ডুর আমলে হুগলির খন্যান এলাকায় ইটাচুনা গ্রামে এক প্রাসাদ গড়ে উঠল। পরিচিতি পেল 'ইটাচুনা রাজবাড়ি' নামে। আঞ্চলিক মানুষজন সেই প্রাসাদ ও সংলগ্ন এলাকাকে 'বর্গীডাঙ্গা' বলে চিনল। স্বাধীনতার পর জমিদারি শেষ হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কুণ্ডুদের জমিদারি বেশ সুনাম অর্জন করেছিল।

বাংলার ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণের স্মারক এই ইটাচুনা রাজবাড়ি। প্রকৃতপক্ষে জমিদার বাড়ি; তবে লোকমুখে ইটাচুনার প্রাসাদ রাজবাড়ি হিসেবেই পরিচিত হয়ে উঠেছিল প্রথম থেকেই। কয়েক বছর ধরে ইটাচুনা রাজবাড়ির একটা অংশ হেরিটেজ হোমস্টে হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

গাইডের মুখে রাজবাড়ির গল্প শুনতে শুনতে ভেতর বাইরে অনেক ঘোরাঘুরি হ'ল। বাড়ির পিছনে এক পুকুরের পাড়ে বসে জানলাম সেখানে বাড়ির মেয়ে বৌরা স্নান, গল্প করতেন। সেই

পুকুরের ধার দিয়ে খানিকটা গিয়ে দেখলাম কুঁড়েঘরের ধাঁচে চারটি অতিথিশালা, যেখানে অতিথিরা থাকতে পারেন গ্রাম্য আবহাওয়ায় | ভেতরে অবশ্য আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে | তারই পাশে একটা বেশ বড়সড় ফুলের বাগান; তাতে নানা চেনা অচেনা ফুলের মেলা | এই জায়গাগুলোতে একটু যেন গা ছমছমে ভাব আছে | বাড়ির বাইরের ট্যুর সেরে ভিতরে ঢুকতে যাবার মুখে একজন ভদ্রমহিলা ট্রে-ভর্তি কাঁসার গ্লাসে জল নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন; সকলের হাতে এগিয়ে দিলেন জলের গ্লাস | বাইরে ঘোরাঘুরির পর ঠান্ডা জল খেয়ে বেশ তৃপ্তি হ'ল |

এবার গাইড নিয়ে গেলেন রাজবাড়ির ছাদে; সেই বিশাল ছাদ থেকে গ্রামের সবুজ এবং সূর্যাস্ত দেখা হ'ল |

ছাদ থেকে নেমে এসে আমরা গেলাম নাচঘরে; যেখানে কুন্দনরা নর্তকী এনে নাচগানের মজলিস বসাতেন | বাড়ির বাইরের ট্যুরের সময় দেখেছিলাম রান্নাঘরের পাশ দিয়ে একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে – সেই সিঁড়ি কেবলমাত্র ব্যবহার হতো এইসব নর্তকী-বাঈজীদের আসাযাওয়ার জন্য | নাচঘরের মাঝখানে বিরাট এক ঝাড়বাতি, একপাশে হাতে টানা বিরাট বড় দুটি পাখা, এক কোনায় বেশ বড় মাপের এক চারপেয়ে দাবার টেবিল/বোর্ড | নাচঘরের চারদিকে বসবার জায়গা | দেওয়ালের এক জায়গায় টাঙানো আছে কুন্দনদের ফ্যামিলি-ট্রী | এখানেই শেষ হ'ল রাজবাড়ির ট্যুর |

সন্ধ্যে নেমে এসেছিল ইতিমধ্যে | আমরা গেলাম ঠাকুর দালানে আরতি দেখতে | আরতি শেষে স্থানীয় লোকজন কিছু গান শোনালেন | তারপর আমরা গেলাম বাগানের মধ্যে এক চাতালে চা-টা খেতে | সেখানে একজন বাঁশিওয়ালা বাঁশি বাজিয়ে আমাদের মনোরঞ্জন করলেন |

রাত সাড়ে নটা নাগাদ আমরা গেলাম রাতের খাবার খেতে আবার সেই রান্নাঘর সংলগ্ন ডাইনিং ঘরে | খেয়ে বেরোবার সময় পরিবেশন করছিল যে ছেলেটি সে বলল সকালে বেড-টি দেওয়া হবে ঘরে ঘরে | দারুণ ব্যাপার! কোনও চাপ নেই, চা দেবার পর বিছানা ছাড়ব |

কুন্ডু পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের কিছু সদস্য এখনও এই রাজবাড়িরই অন্য অংশে বসবাস করেন | তাঁদেরও খাবার ব্যবস্থা অতিথিদের যেমন ব্যবস্থা তেমনই |

লোকে বলে রাতের মৃদু আলোয় রাজবাড়ির সর্বত্র নাকি অতীতের ফিসফিস শোনা যায় | আমাদের যদিও সে সৌভাগ্য হয়নি; হলে কী হতো অবশ্য বলতে পারি না – হয়তো চৈতন্য হারিয়ে ফিসফিস শোনার মতো অবস্থাতেই থাকতাম না! তার বদলে আমরা বেশ আরাম করেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম |

সকাল হতেই আবার সেই বাঁশির সুর কানে এল | দরজায় কড়া নেড়ে একটি ছেলে চা-বিস্কুট দিয়ে গেল | এ বেশ মজার ব্যাপার – সকালে উঠে নিজের গরম পানীয় নিজেই তৈরি না করে পেয়ে গেলাম পটভর্তি ধূমায়িত চা; যদিও ঘরে চা-কফির ব্যবস্থাও পুরো মাত্রায় ছিল |

এরপর ফেরার পালা | বিছানায় বসে চা বিস্কুট খেয়ে, জিনিসপত্র গুছিয়ে, স্নান সেরে, ঘর খালি করে আবার চলে গেলাম প্রাতরাশ সারতে সেই ডাইনিং ঘরে | লুচি, বেগুনভাজা, ছোলার ডাল, ফুলকপির তরকারি আর অবশ্যই বাঙালি ঐতিহ্যের মিষ্টিসহ ব্রেকফাস্টটা বেশ জমিয়ে হ'ল |

রাজবাড়ির অফিসে টাকাপয়সার হিসেব চুকিয়ে বেরোবার মুখে একজন ভদ্রমহিলা একটা থালায় ঠাকুরের ফুল ও জল নিয়ে, মাথায় ফুল ঠেকিয়ে বললেন, "আবার আসবেন |" রাজবাড়ির কর্মীরা যাঁরা সামনে ছিলেন সকলেই হাত নেড়ে বিদায় জানালেন |

আমাদের এমন সুন্দর ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আমাকে আপ্লুত করল |

বিশাল প্রাঙ্গণের চারদিকে বিভিন্ন মহল | বিরাট বৈঠকখানা, উঁচু সিলিং থেকে ঝুলছে পুরনো আমলের সব ঝাড়বাতি | হাতে টানা প্রাচীন পাখা, বনেদি আসবাবপত্র, টানা দরদালান, চওড়া সিঁড়ি, সন্ধ্যায় ঠাকুর দালানে আরতি, রাজকীয় পরিবেশে বিশ্রাম, দুর্দান্ত খাওয়াদাওয়া, সঙ্গে গ্রাম দর্শন, কাছেপিঠে বেড়ানো – সব মিলিয়ে ইটাচুনা রাজবাড়িতে অবকাশ যাপন এক ভিন্ন স্বাদের অভিজ্ঞতা |

সান্ধ্য-আকাশের নিচে ইটাচুনা রাজবাড়ি

পুরী স্পেশাল

বৈশাখী চক্কোত্তি

বছর খানেক আগের কথা| আমরা সবাইমিলে গিয়েছিলাম পুরী বেড়াতে | আমরা বলতে – আমার বর-সুমন, আমার আড়াই বছরের ছেলে-লাড্ডু, আমার দিদি-রাধা ও জামাইবাবু-মাণিকদা, ছোটবোন-গুড্ডু, ছোটভাই-ছোটু, আমাদের বহুদিনের পারিবারিক দাদা-হরিদা আর আমি | বেশ বড় একটা দল | সব মিলিয়ে আটজন |

পুরীতে মাণিকদার অফিসের হলিডে হোম বুক করা হয়েছে | ফেব্রুয়ারী মাস | সময়টাও খুব সুন্দর; না গরম, না ঠান্ডা | আর পুরী তো চিরবসন্তের দেশ | আমার বোন গুড্ডু এম এ পাস্ করে বি এড করছে আর ছোটু এঞ্জিনিয়ারিংয়ের সেকেন্ড ইয়ার | সবে পরীক্ষা শেষ হয়েছে | আমার বর সুমনেরও এই সময় জমানো ছুটি নেওয়ার ছিল | জামাইবাবু তাই ব্যবস্থা করে ফেললেন | হৈহৈ করে সবাই রওনা হলাম পুরীর পথে |

প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমার বোন গুড্ডু বরাবরই একটু গোলগাল, আর আমার ছেলে লাড্ডু ফর্সা ধপধপে আর গোল | তাই গুড্ডুর সাথে নাম মিলিয়ে ওর নাম রাখা হয় লাড্ডু | সুমন একটু শান্ত প্রকৃতির আর জামাইবাবু-মাণিকদা ঠিক ততটাই হৈচৈ পছন্দ করেন | গুড্ডু আর ছোটু পিঠোপিঠি তাই এখনো সবসময় ঝগড়া, মারামারি লেগেই থাকে | ছোটু সবসময় গুড্ডুর পিছনে লাগে | আর গুড্ডু রেগে গিয়ে তাড়া করে | আমরা সবাই উপভোগ করি | আর হরিদার হাতের রান্নার জবাব নেই! আমরা ইচ্ছে করেই হলিডে-হোম বুক করেছি, যাতে নিজেরা ইচ্ছেমতো রান্না করে খেতে পারি |

রাত ন'টার ট্রেন হাওড়া থেকে | পুরীতে পৌঁছাবে ভোরবেলায় | মালপত্র নিয়ে সবাই হাওড়ায় পৌঁছেছি আটটার সময় | আমার কোলে লাড্ডু | ও কিছুই বুঝতে পারছে না | খালি ট্রেন দেখে 'এ', 'ও' বলছে, কিন্তু বেশ একটা খুশি খুশি ভাব, কান্নাকাটি করছে না | আমাদের ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দিয়ে দিয়েছে | সবাই হাতে ব্যাগ নিয়ে এগোচ্ছে | আমাদের এসি কোচ | আমার কোলে লাড্ডু তাই হাতে একটা ছোট ব্যাগ | সুমন নিয়েছে বাকিগুলো | আমার পাশে গুড্ডু একটা ঢাউস ব্যাকপ্যাক নিয়েছে | ঠিক সামনে ছোটু, একটা ট্রলি ব্যাগ আর রুকস্যাক নিয়ে | দিদি, মাণিকদা আর হরিদা এগিয়ে গেছে আগে | গুড্ডু ডানদিকে মানে আমার দিকে দেখতে দেখতে এগোচ্ছে কারণ আমি ট্রেনের পাশ দিয়ে এগোচ্ছি | হঠাৎ শুনলাম গুড্ডুর গলার আওয়াজ, 'আঁই'; ব্যস, তারপর আর গুড্ডুকে দেখতে পেলাম না | কোথায় গেল রে বাবা! পাশেই তো ছিল | ঠিক সামনে ছিল ছোটু | ওর কানেও গেছে গুড্ডুর ওই অদ্ভুত আওয়াজ | আমি দেখতে পাচ্ছি না | ইতিমধ্যে ছোটু পিছন ফিরে হঠাৎ 'হি হি হে হে হো হো হো হো' করে ধীরে থেকে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লেগেছে | আমরা সবাই অবাক হয়ে পিছন ফিরে দেখছি কি হ'ল! যা দেখা গেল, সেটা এরকম, গুড্ডু উপুড় হয়ে কিছু একটার ওপর ঝুলছে | কিসের ওপর হঠাৎ ঝুলতে লাগল ঠিক বোঝা গেল না | একটু পিছিয়ে গিয়ে দেখলাম, একজন ভদ্রলোক নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধছিলেন | গুড্ডু আমার দিকে তাকিয়ে হাঁটছিল কোচ নম্বর দেখার জন্য | সামনে দেখতে না পেয়ে সটাং ভদ্রলোকের পিঠের ওপর গিয়ে পড়েছে, পুরো যোগ চিহ্নের মতো করে | ভদ্রলোক হঠাৎ বুঝতে পারলেন না তাঁর পিঠে কোন কুলি বিশমণি বোঝা চাপিয়ে দিল! তিনি পরিত্রাহি চিৎকার করছেন, "আরে আরে এ কী হ'ল? কে আমার পিঠে কী চাপিয়ে দিল? আমি তো জুতোর ফিতে বাঁধছিলাম | ও দাদা! কে কোথায় আছেন? একটু হেল্প করুন | আমি কুলি নই | আরে ও দাদা, মালটা তুলুন দয়া করে |" আর দয়া! গুড্ডু এমনভাবে পড়েছে যে পা এবং হাত সব ঝুলছে | কিছুতেই ব্যালেন্স পাচ্ছে না | পরিত্রাহি চিৎকার করছে, "ছোটু, এই ছোটু, আমাকে তোল না |" ছোটু ওকে তোলার বদলে হি হি করে হাসছে | শেষে সুমন আর ছোটু গিয়ে গুড্ডুকে ধরে দাঁড় করল | ভদ্রলোক তখনও নিচু হয়েই রয়েছেন আর বলছেন, "আমার পিঠটা ভেঙে গেল | আমার মেরুদন্ড বেঁকে গেল | আমাকে প্লিজ কেউ সোজা করে দিন না | ওই মহিলা হাতির মতো চেহারা নিয়ে হঠাৎ কোথা থেকে টপকে এসে আমার ওপর আক্রমণ করলেন, কেন যে করলেন কিছুই জানি না | দাদা, আমাকে দয়া করে সোজা করে দিন |" ছোটু হাসতে শুরু করলে আর থামে না | ভদ্রলোককে দেখে আরো জোরে হাসতে লাগল | শেষে সুমন আর ছোটু গিয়েই ভদ্রলোককে সোজা করল আর আমরা অবশেষে ট্রেনে উঠলাম |

সবাই ট্রেনে গুছিয়ে বসেছি | পুরো আটটা বার্থ | পাশের দুটো,

আর একদিকের তিনটে আর একদিকের একটা| শুধু বাকিদুটো পাশের ক্যুপে| আমাদের সাথে একদিকের লোয়ার আর মিডলে এক মারোয়াড়ি দম্পতি| ওঁরা বার্থ চেঞ্জ করতে চান না| তাই ছোটু আর হরিদা পাশের ক্যুপে আছে| রাত দশটা বাজে| এবার খাবার পালা| ছোটু আর হরিদাও এদিকে এসেছে| হরিদার হাতের লুচি, চিকেন কষা, ফিশ ফ্রাই আর সঙ্গে নতুন গুড়ের সন্দেশ| এই হ'ল মেন্যু| হরিদা আর দিদি সবাইকে খাবার ভাগ করে দিচ্ছে| লাড্ডু অনেক আগেই দুধরুটি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে| মারোয়াড়ি দম্পতি শাকাহারি| ওঁদের নিজেদের খাবার নিয়ে বসেছেন| দিদি সবাইকে ফিশ ফ্রাই পরিবেশন করছে| মারোয়াড়ি দম্পতির পাশে ছোটু বসেছে আর যথারীতি গুড্ডুকে খাওয়া নিয়ে রাগাচ্ছে| সন্ধ্যেবেলার ঘটনাটা নিয়ে আমাদের মধ্যে তখনও হাসাহাসি চলছে| বেশ মনোরম পরিবেশ| দিদি সবাইকে ফ্রাই দেবার পর ছোটুকে একটা দিতে যেই হাতটা বাড়িয়েছে ঠিক সেই সময় ট্রেনটা সজোরে ব্রেক কষল| দিদি উল্টোদিক থেকে ঝুঁকে ছোটুর পাতে ফ্রাইটা দিচ্ছিল, হঠাৎ ব্রেক কষার ফলে দিদির ফ্রাই সমেত হাতটা ছোটুর পাতে না গিয়ে সোজা চলে গেল মারোয়াড়ি ভদ্রলোকের মুখের ভিতর| আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই যা হবার হয়ে গেল| এক মিনিট সবাই চুপ| তারপর মারোয়াড়ি ভদ্রলোক বিকট হুঙ্কার দিয়ে বজ্রপাতের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন, "মেরে জাত, ধরম সব কুছ চলা গয়া, মুঝে জবরদস্তি মছলি খিলায়া, সত্যনাশ হো গয়া| রাম রাম, রাম রাম" বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে ওয়াশরুমের দিকে যেতে গিয়ে পাশের ক্যুপের একটি ইয়ং সুন্দরী মেয়ের গায়ে হুড়হুড় করে বমি করে দিলেন| মেয়েটি চিল চিৎকার করতে লাগল| অন্যান্য লোকেরা না বুঝেই মারোয়াড়ি ভদ্রলোককে যা-তা বলতে লাগল| সব মিলিয়ে এক বিদিগিচ্ছিরি পরিবেশ! আমরা মূক ও বধির হয়ে গেছি| দিদি এমন ভাব করছে যেন কিছুই জানে না| ছোটু প্রাণপণে হাসি চাপার চেষ্টা করছে| শেষমেশ মারোয়াড়ি দম্পতি আমাদের ওপর রেগে গিয়ে পাশের ক্যুপে চলে গেলে ছোটু ও হরিদা আমাদের ক্যুপে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল| মাণিকদা আর সুমন বিকট হাসতে লাগল, ছোটুও ওদের সাথে যোগ দিল| সে রাতের মতো যবনিকা পতন!

পুরী পৌঁছানোর পর জগন্নাথ দেবের মন্দির দর্শন, পুজো দেওয়া, ভোগ খাওয়া, সব মিলিয়ে দুটো দিন খুবই আনন্দে কাটল| তবে পুজো দিতে গিয়ে এক বিপত্তি| জগন্নাথ দেবের মন্দিরে বেশ কিছু বাঁদর আছে| লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছি সকলে| অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে করতে লাড্ডু খিদেয় কাঁদতে শুরু করল| সুমন একজন কলাওয়ালার কাছ থেকে এককাঁদি বড় মর্তমান কলা কিনে আনল; লাড্ডুর সাথে ছোটু, মাণিকদা, হরিদা, সুমন ও নিজের জন্য| কলার কাঁদিটা সুমন ছোটুর হাতে ধরিয়ে লাড্ডুকে আমার কোল থেকে নিতে এল| ছোটু একহাতে কলার কাঁদি ধরে আর একহাতে মোবাইল ফোনে কথা বলছিল একটু অন্যমনস্কভাবে| সুমন যেই লাড্ডুকে আমার কাছ থেকে নিয়ে ছোটুর কাছে যাবে, একটা বাঁদর হঠাৎ সুযোগ বুঝে ছোটুর হাত থেকে ছোঁ মেরে কলার ছড়া নিয়ে হাওয়া; সোজা নাটমন্দিরের পাঁচিলের ওপর| মাণিকদা "এই এই, ধর ধর, দে দে" করে উঠলেন| কে কাকে ধরবে? কে ফেরৎ দেবে? কলার কাঁদি তখন পাঁচিলের ওপর বাঁদর ফ্যামিলির কব্জায়| অন্যমনস্ক হবার জন্য ছোটু মাণিকদার কাছ থেকে বকুনি খেয়ে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে হাসতে বলল, "বাঁদরগুলোর খুব খিদে পেয়েছিল, ভালই হয়েছে|" লাড্ডু কিছু বুঝতে না পেরে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে লাগল| কলা খাওয়া মাথায় উঠল! অবশেষে আমরা পুজো দিয়ে ফিরলাম|

পরের দিন নন্দন কানন ভ্রমণ| সকাল থেকে সকলের উৎসাহ আর ধরে না| অন্যান্য পশু-পাখি দেখার পর বাঘ দেখার জন্য স্পেশাল বাসে সাফারিতে ঢুকলাম| খুব কাছ থেকে বাঘ দেখা যাবে| উত্তেজনায় গা ছমছম করছে| বাঘের খুব কাছ ঘেঁষে যখন বাস নিয়ে যাচ্ছিল, গুড্ডু উৎসাহভরে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখার জন্য দাঁড়িয়েছিল| হঠাৎ একটা বাঘ খুব কাছে এসে যাওয়াতে বাসটা তাড়াতাড়ি একটু স্পিড বাড়িয়ে দেয়| বাঘটা জানলার কাছে আসতে গুড্ডু "ও মাগো" বলে লাফিয়ে পেছিয়ে আসে আর সেই সময়েই বাসটা স্পিড বাড়ানোর ফলে গুড্ডু নিজের সিট্ থেকে ফসকে গিয়ে সার্কাসের মেয়েদের মতো জিমনাস্টিক করে দুবার পাক খেয়ে নাচতে নাচতে সোজা উল্টোদিকে বসা ওর সমবয়সী একটি ইয়ং ছেলের কোলে গিয়ে ধপাস| ছেলেটি জানলা দিয়ে বাঘ দেখতে ব্যস্ত ছিল হঠাৎ কোলে কিছু ধপ করে পড়তে সে বাঘ দেখতে দেখতে "আঁ আঁ" চিৎকার করে অজ্ঞান| কারণ সে

ভাবল যে জানলার বাইরের বাঘটাই এসে তাকে অ্যাটাক করেছে। তাড়াতাড়ি জল-টল দিয়ে তাকে সুস্থ করা হ'ল। ছোটু ক্রমাগত হাসতে লাগল। গুড্ডুর মুখ লজ্জায় লাল। সে অন্য সিটে বসে জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখল। আমরা সবাই নিজের নিজের হাসি চাপার চেষ্টা করতে লাগলাম। অবশেষে বাঘ দেখা সুসম্পন্ন হ'ল।

পরের দিন ফেরার পালা। সে রাত্রে হরিদার হাতের ইলিশমাছ ভাজা, কাঁচা ইলিশের ঝাল আর গরম ভাত খেয়ে, প্যাকিং শেষ করে সবাই তাড়াতাড়ি শুয়েছি। আমরা দুটো ঘর নিয়েছিলাম। একটা বড় খাটে মাণিকদা, সুমন, লাড্ডু, গুড্ডু আর আমি। দিদি মেঝেতে। পাশের ছোট ঘরে ছোটু আর হরিদা। রোজ এভাবেই শোয়া হয়েছে। খাওয়া ও সব কাজ সারার পর বাঘের গল্প এবং গুড্ডুর অধঃপতনের গল্প করতে করতে যে যার শুয়েছে। আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাণিকদার নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। লাড্ডু ঘুমোনোর পর আমি গুড্ডুর দিকে পাশ ফিরে শুয়েছি। হঠাৎ শুনি দিদির গলা, "আঁ আঁ, ব-বা-বা...ঘ। বাচাঁও। বাচাঁও। কে কোথায় আছ। ওরে বাবারে।" মাণিকদা ঘুমের ঘোরে "কী কী; কী হ'ল, কী হ'ল?" বলে চিৎকার করছেন। হরিদাকে ডাকছেন, "হরি, এই ব্যাটাচ্ছেলে হরি, আলোটা জ্বাল না..." হরিদা পাশের ঘর থেকে উত্তর দিল, "আমি তো এঘরে, ওরে বাবারে, ও ঘরে বাঘ, আ-আ-আমি কী করে যাব? অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।" দিদি সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে। আমরা সবাই উঠে বসে হৈচৈ করছি, কিন্তু নিচে নেমে কেউ আর আলো জ্বালতে পারছি না। মাণিকদা হরিদার গুষ্টির তুষ্টি করতে করতে নিচে নামতে যান। শোবার সময় লুঙ্গির ফাঁসটা বরাবর আলগা করে শোন, তাড়াহুড়োতে লুঙ্গি নিচে নেমে যাচ্ছে। একহাতে লুঙ্গি ধরে মাণিকদা কোনোরকমে আলোর সুইচটা জ্বালান। ও ঘর থেকে ছোটু আর হরিদা দরজার কাছে এসে ড্যাব ড্যাব করে দেখছে, মাণিকদা লুঙ্গি ধরে তাতা থৈথৈ করে যাচ্ছেন; আমরা হতভম্ব! অভাবনীয় দৃশ্য! দিদি পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। আর বাঘটা আরামে দিদির পিঠের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে। বাঘটা আর কেউ নয়, লাড্ডু। কখন বিছানা থেকে গড়িয়ে দিদির পিঠের ওপর পড়েছে আমরা জানি না। দিদি বাঘ ভেবে চোখ বুজে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। মাণিকদা লুঙ্গিটা কষে বেঁধে দিদিকে চোখ খুলতে বললেন। দিদি চোখ খুলে লাড্ডুকে দেখতে পেল; আর ততক্ষণে ছোটু, হরিদা, সুমন, গুড্ডু, আমি সবাই একসাথে হাসির তুফান তুলেছি। দেখতে দেখতে রাত শেষ।

ফেরার পথে সবাইমিলে সুন্দর সুখের ও মজার স্মৃতিগুলো মন্থন করতে করতে ট্রেন-জার্নিটা বেশ ভালই উপভোগ করলাম।

পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির

প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা ১৪৩২ (2025)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা বা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক,
তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।
কেবলমাত্র Google বাঙলায় টাইপ করা লেখা নেওয়া হয়।
https://www.google.com/intl/bn/inputtools/try/ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টাইপ করুন।
লেখা pdf করে পাঠাবেন না। **Word-**এ পাঠাবেন। প্রসঙ্গত Vrinda টাইপও ঠিক হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:
Malabika Chatterjee
6 Wimberly Court
Decatur, GA 30030-2802
e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321
e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২৫ ডলার।
প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) 'প্রবাস বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
লেখা পাঠাবার ইচ্ছা থাকলে নববর্ষ আর দুর্গাপুজোর পনেরো দিন আগে লেখা জমা দিন।
এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রবাস বন্ধু ওয়েববসাইটে **https://www.prabashbandhu.org/**
রবি ও চন্দ্রা দে-র বাড়িতে পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা বই আছে।
সেগুলি সভ্যরা ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401
Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com

শুভ নববর্ষ